যুদ্ধযাত্রা

যুদ্ধযাত্রা

মাণিক চট্টরাজ

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ
কামিনী প্রকাশালয়
১১৫, অখিল মিস্ত্রী লেন
কলিকাতা-৯

প্রকাশক ঃ
শ্যামাপদ সরকার
১১৫, অখিল মিস্ত্রি লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ—১৩৬৯

মুদ্রাকর ঃ
তাপস কুমার হাটাই
নিউ তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২৬, বিধান সরণী

যুদ্ধযাত্রা

নাক

আমি রঙ কারখানার চাকরী থেকে বরখাস্ত হই। বছরের গোড়া থেকে ছোটখাটো ঝামেলা চলছিলো। শেষ পর্যন্ত অফিসার ওপরওয়ালার কাছে রিপোর্ট দিলো আমি একটা অপদার্থ। কথাটা এমন কিছু নতুন বলে নি; অনেকদিন হলো বন্ধুরা আড়ালে এবং আত্মীয়স্বজনেরা মুখোমুখিই আমাকে অপদার্থ বলে থাকে। এসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। আমি বরং নিজেকে খুবই বুদ্ধিমান মনে করি। সিনে ক্লাবে গদারের ছবি দেখে আমি যেমন উত্তেজিত হই, শরৎবাবুর 'দত্তা' পড়তে গিয়ে ঠিক একভাবে আমার চোখে জল আসে। এই রকম আবেগ টাবেগ নিয়ে আমি খাঁটি মাঝারী সাইজের ভদ্রশ্রেণীভূক্ত। এমনিতে বন্ধুবান্ধব বা বাইরের লোকের কাছে আমি খুবই নিরীহ প্রাণী। শুধু বাড়িতে হঠাৎ ছোট ভাই কিংবা বৌদির ওপর হম্বিতম্বি করে ফেলি। তবে সেটা খুব কমই হয়। অন্যের সমৃদ্ধি দেখলে স্বাভাবিক নিয়মে আমার হিংসে হয়। কিন্তু বাইরে প্রকাশ করি না। হিংসা একটি সংক্রামক রোগ। সুতরাং আমি অন্যের ভিতরে সেই বিষ ঢুকিয়ে দিই চালাকি করে। বিবেকানন্দ নাকি কোথায় বলে-

ছিলেন, চালাকি করে কোন মহৎ কাজ করা যায় না। আমাদের ভদ্রলোকদের সঙ্গে সায় দিয়ে কথাটা আমি একবিন্দু বিশ্বাস করি না। এ ধরনের শ্রেণী বিরুদ্ধ নীতির আমি একেবারে বিপক্ষে। হলফ করে বলতে পারি, একমাত্র চালাকির দ্বারাই আমাদের যাবতীয় উন্নতিমূলক কাজকর্ম সম্পন্ন হয়। অনেক ভেবে দেখেছি এ ব্যাপারে চোখ কান নাক ও জিভ এই চারটি ইন্দ্রিয় খুব দরকারি। অবিশ্যি চামড়ারও একটা ভূমিকা আছে। তবে সেটা মোটা পাতলাজাতীয় সমস্যায় কাজে লাগে। তো আমাব চোখ কখনো সখনো তার অনুষঙ্গ পালটে দেয়। তখন লম্বা চওড়া সুদর্শন দাদা ছোটখাটো কদাকার বামনের চেহারা নেয়, কিংবা পথের লাইটপোস্ট উট হয়ে চোখ পিট পিট করে গলা বাড়িয়ে। আমি নির্বিকার এইসব দেখি শুনি। দুপুরে খেয়ে দেয়ে পাক্কা দেড় দু ঘণ্টা লম্বা হই। তবে সেটা রোজ না। মাঝে মধ্যে পাড়া ঘুরতে বেরুই আমি। তখন চা-সিগারেটের পয়সা জোগায় বৌদি। মা-বৌদিরা সাধারণত এরকমই হয়। ওরা না থাকলে বেকার ছেলেপিলেদের কি হাল হতো তা নিয়ে আমি অবিশ্যি মাথা ঘামাই না। বৌদি আমার বেকারত্বের প্রতি যথেষ্ট নরম। যখন যা দরকার মোটামুটি হাসিমুখেই দিয়ে থাকে সে। এমনকি হঠাৎ কখনো রাশভারী অধ্যাপক দাদার সামনে পড়ে গেলে প্রশ্নটশ্নের টানাটানিটাও সেই সামলায়। প্রশ্নগুলো ওই চাকরীঘেঁষা আর কি। বৌদির মুখে বেকার সমস্যার হাল খবর শুনে দাদা প্রায় দিনই খুশি হয়ে যান। এর থেকে

আমার মনে হয়েছে তিনিও যথেষ্ট সুবিবেচক। নেহাৎ অধ্যাপনা করতে গিয়ে চারিদিকের খবর টবর খুব একটা রাখতে পারেন না এই আর কি। ছোট ভাই এম. এ. পড়া আর চাকরীর দরখাস্ত একসঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছে। বলতে ভুলে গেছি খুব ছোটবেলায় আমার মা মারা গেছেন বলে এখন আর বিশেষ মনে পড়ে না। আর দরকারগুলো তো বৌদিই সাধ্যমতো মেটাচ্ছে। এদিক দিয়ে সে মা এবং বাবার মাঝামাঝি আসনে গ্যাঁট হয়ে বসেছে। তা বৌদি দেখতে শুনতে ছিমছাম একটু 'ভালেমানুষের মেয়ে' গোছের। বিশেষ কোন বায়নাও করতে শুনি নি দাদার কাছে। শুধু একটু পারফিউমের সখ আছে তার। এই স্নোটা আশটা কিংবা একটু সৌখীন সেন্টের গন্ধ তাব বেশী কিছু নয়। আমাদের কালীঘাটের এই ছোট্ট তিনতলার ফ্ল্যাটে সব সময়েই সুগন্ধ ভরে থাকে। সত্যি কথা বলতে গেলে এটা আমার মন্দ লাগে না। আমরা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত। ভালো এবং সুন্দরেব দিকে আকর্ষণ আমাদের স্বভাবের একটা ঝোঁক। এই ঝোঁকের বশেই আমরা আর একটু উঁচু মানুষদের হিংসেটিংসে করি। তা এটা একটা প্রতিযোগী ভাব ছাড়া আর কিছু নয়। নইলে কে না জানে রক্তে আমাদেব শিক্ষা এবং আভিজাত্য বয়ে চলেছে। যে কোন ব্যাপারে অখুশি হলে আমাদের আত্মা তৃপ্তি পায়। ঠিকই আত্মার কথা এসে পড়লে দর্শন দর্শন একটা গন্ধ নাকে এসে লাগে। অথচ কথাটা এড়িয়ে যেতেও পারি না। কেননা ওটার অস্তিত্বে এবং অনস্তিত্বে আমরা সমান বিশ্বাসী। যুক্তিটা

এইরকম দিলে ভালো হয়। যেমন অবিশ্বাস থেকে আমরা ঘুষ নিই এবং বিশ্বাসের ভয় আমাদের কালীঘাটে পুজো দিতে ছোটায়। যে যাই মনে করুক এই 'সন্দেহ' নামের বোধটি আমাদের চরিত্রকে বেশ অহঙ্কারী করেছে। এহেন বৈশিষ্ট্যে গর্বিত আমি সম্প্রতি একটি আজব সমস্যা থেকে এড়িয়ে থাকার জন্য যতক্ষণ পারি ঘুমিয়ে কাটাচ্ছি।

এই প্রসঙ্গে দু একটি জরুরী কথা আগে বলে নেয়া দরকার। কাজ করতে করতে হঠাৎ বেকার হবার ফলে প্রথম প্রথম একটু লজ্জা হতো। বছরখানেক কেটে যাবার পর ওসব পাট চুকে গেছে। এখন আর পাঁচটা ছেলের মতো নির্বিকার অন্নধ্বংস করছি দাদার। কেউ কেউ এই সুযোগে দুচার কথা বলেই ফেলে। ওসব গায়ে না মেখে আমি এপাড়া সেপাড়া টইল দিই, বন্ধুদের সঙ্গে দেদার আড্ডা মারি। এই নির্ভেজাল অবকাশ যাপনের মধ্যে আমার একটি মাত্র সংসারের কাজ সকালে বাজার করা। ওটা খানিকটা নিজের স্বার্থেও বটে। কেননা টুকটাক খরচ বেশ চলে যায় দেখেছি। সত্যি বলতে কি এই নির্দিষ্ট কাজটির অভিজ্ঞতা থেকেই আমার বর্তমান অবস্থার জন্ম। প্রত্যেক ঘটনার একটি উপলক্ষ্য থাকে বলে ঘটনা তৈরী হয়। অন্তত এ ব্যাপারে 'নিপাতনে সিদ্ধ' নামের সূত্র অচল। এক্ষেত্রে আমার রোজ বাজার করা উপলক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। যার ফলে মাছওলা রতন দাসের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা। অবিশ্যি ঘনিষ্ঠতা না বলে বলা উচিত একটু বেশি আলাপ।

তার মানে পথে ঘাটে দেখা হলে দু এক মিনিট দাঁড়িয়ে যাই। মাছের ব্যবসা উঠতি না কমতির দিকে, কিংবা পরিবারের খবর টবর ভালো কিনা এরকম দুচারটে প্রশ্ন করি। রতন দাস ওতেই খুশিতে ডগমগ হয়ে যায়। আর এতে অবাক হবার কিছু নেই। কোন সজ্জন শিক্ষিত অমুক বাবু তার মতো নীচু স্তরের মানুষের পারিবারিক কুশল জানতে চাইলে কৃতজ্ঞ হবার কথা। একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি। বাজারে, বস্তীতে কিংবা পথে যেখানেই দেখা হোক কাঁচা মাছের আঁশটে গন্ধ রতনের সারাগায়ে লেপ্ট থাকে। যাই হোক ওর কৃতজ্ঞতা আমার অহঙ্কারে বেশ আরামের সুড়সুড়ি দেয়। এরকমও হয়েছে দুপুরে উদ্দেশ্যহীন ঘুরতে ঘুরতে রতনের বস্তীতে গিয়ে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে এসেছি। অবিশ্যি পাড়াপড়শীর চোখে পড়ে খবরটা দাদার কানে না ওঠে সে ব্যাপারে আমি খুবই সাবধান। এসব সামাজিক জটিলতা রতন দাসের মতো মানুষেরা বোঝে না। ক্ষুৎকাতর প্রবৃত্তিটা আদিম এবং একমাত্র বিষয়। সেই ঘরোয়া সমস্যার মধ্যে ওদের চাঁদ-সূয্যি গড়িয়ে যায়। ভদ্রসন্তানদের হয়ে যদিও ওদের আমি কৃপাই করতাম ওদের ব্যবহারে কিন্তু কোন ভ্রূক্ষেপ ছিলো না। আসলে এসবের বৈজ্ঞানিক কারণ নিয়ে রতন দাসের কোন মাথাব্যথা নেই। না থাক। কিন্তু আমার আছে। এই যেমন মাস দেড়েক আগে রতনের বিয়েতে আমাকে নেমন্তন্ন করেছিলো। আমি যাই নি। কেননা আমার শ্রেণী সম্পর্কে আমি যথেষ্ট হুঁশিয়ার এবং অহংকারী। তা বলে

মুখে শুভেচ্ছা জানাতে ভুল করি নি। আঁশটে গন্ধ মাখা রতন দাস খুশি হয়ে গেছে তাতেই। চমকে যাওয়ার কিছু নেই! চালাকি দিয়ে কত বড় সড় মানুষকে কায়দা করে ফেলি আমরা, আর এতো রতন মাছওলা। আশ্চর্য্য এই আমার মতো একটি খাঁটি আলোকিত মানুষ সামান্য একটা বিষয়েব কথা ভাবতে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেললাম একদিন।

গেল সপ্তাহে খুব সম্ভব সেটা শনিবার। টুকটাক কাঁচা আনাজ কিনে মাছের বাজারে ঢুকেছি। বড্ড ভিড় সেদিন! সব দোকানের সামনে কমপক্ষে একজন মানুষ। মাছি উড়ছিলো ঝাঁক বেঁধে। জল আর কাদায় মিশে সরু পথটা ভীষণ নোংরা। এখানে সেখানে মাছের নাড়ি ভুঁড়ি আর রক্ত ছিটানো। পায়ের ফাঁক দিয়ে অদ্ভুত কায়দায় গলে যাচ্ছে নেড়ি কুত্তা। চারদিকে ঠেলাঠেলি ঘাম আর আঁশটে গন্ধে মেশানো হাওয়া। খুব সাবধানে পা ফেলে রতনের দোকানের সামনে গিয়ে একবার পাজামার পেছনটা দেখে নিলাম। না দাগ লাগে নি। এভাবে পা টিপে টিপে গা বাঁচিয়ে চলা আমাদের সূক্ষ্ম কায়দা। রতনের দোকানের সামনেও বেশ ভিড়। কাউকে ল্যাং মেরে কাউকে কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে রতনের সামনে উবু হয়ে বসে পড়লাম আমি। তারপর মুখ তুলেই রীতিমতো চমকে উঠলাম। নেহাৎ মামুলি বলেই ব্যাপারটা এতোদিন মনোযোগ এড়িয়ে গেছে আমার। কিংবা হতে পারে পরিবেশের মধ্যে একটা অন্যজাতের উপাদান ঢুকে পড়ায় নতুন প্রতিক্রিয়া তৈরি হচ্ছে

চলেছে। পরে ভেবে দেখেছি, ব্যাপারটা ঠিক বেগুন গাছে আমলকী ফল জন্মাবার মতো অদ্ভূত। সত্যি বলতে কি সেদিন মাছ নিয়ে দরদাম করার আগের মুহূর্তে রতন মাছওলার গা থেকে খুব চেনা সেণ্টের সুগন্ধ নাক দিয়ে সরাসরি মগজে বিঁধে আমাকে হতভম্ব করে ফেললো। রতন বোধ হয় আমার নাকের পেশীর নড়াচড়া লক্ষ্য করে থাকবে। ভিড় বাঁচিয়ে ঝুঁকে এসে চাপা গলায় বললো—কি করবো দাদা, বেরোবার মুখে বউ জোর করে গায়ে ঢেলে দিলো। চেয়ে দেখি রতনের বুকখোলা পাঞ্জাবীর ওপর মেয়েলী হাতে সুন্দর এমব্রয়ডারী ফুল তোলা, মাথার চুল পাট করে আঁচড়ানো, মুখ চকচক করছে খুশিতে। হতচকিত আমি চোখ বন্ধ করে একবার বাসার কথা ভেবে নিলাম, গলার মধ্যে খুক খুক কাশলাম, নাকের মধ্যে সুরুৎ করে হাওয়া টেনে সহজ হওয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু যত কায়দাই করি না কেন আমার ভ্যাবাচ্যাকা অবস্থার কোন পরিবর্তন হলো না। ধন্দটা তখন এইভাবে এলো, ভিন্ন শ্রেণীতে অবস্থান করেও রতন মাছওলাদের রুচি এবং আবেগ টাবেগ কি করে আমাদের সমগোত্রীয় হতে পারে। আমার বৌদি লেখাপড়া শিখেছে—এবং আলোকিত প্রাণী। সুন্দর এবং যে কোন সংস্কৃতির দিকে আমাদের টান জন্মসূত্রে। উঁচু সমাজের ওপর হিংসে মেশানো লোভ এবং নীচুর দিকে তাচ্ছিল্য আমাদের বৈশিষ্ট্য। কৈশোরে আমরা রোমান্টিক স্বপ্ন দেখি, যৌবনে ওপরে ওঠার হুড়োহুড়ি, বার্ধক্যে দর্শন। এই ছিমছাম নক্সার মধ্যে রতন মাছওলা

অনধিকার ঢুকে পড়ে আমার মাথা টাতা একদম গুলিয়ে দিয়েছে। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে বৌদির ওপর কড়া নজর রাখলাম। বৌদি যখন মাছ কুটে রান্নাঘর থেকে বেরিয়েছে আমি ঝট্ করে তার হাত ধরে গন্ধ শুঁকে নিলাম। 'কি হচ্ছে কি' এই জাতীয় একটা ধমক লাগালো বৌদি। বোধ হয় ভেবে নিলো নিষ্কর্মার ঢেঁকির মাথায় কোন উদ্ভট খেয়াল চেপেছে। কিন্তু আমার তখন তুরীয় অবস্থা। বৌদির হাত থেকে এমন একটা আঁশটে গন্ধ পেয়েছি যা রতন দাসের শ্রেণীগত অবস্থাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে। এমন কি আমাদের ফ্ল্যাটের সব জায়গায় যে সুন্দর গন্ধের অস্তিত্ব, মাছওলা জাতীয় মানুষের ঘরেও তা এখন আস্তে আস্তে ঢুকে পড়ছে। এ কি অদ্ভুত ব্যাপার। ওরা গণ্ডারের মতো শুধু খাটে। আমরা চালাকি করে ফল ভোগ করি। ওরা বাঁশ কেটে বাঁশি বানায়। আমরা সুর তুলে শিল্পী হই। সুতরাং গন্ধের এরকম শ্রেণীহীন যাচ্ছেতাই আচরণ দেখে আমার রাগ এবং অস্বস্তি এক সঙ্গে হলো। এরপর আমি রতন দাসের গা এবং মাছ কাটার পর বৌদির হাত নিয়মিত শুঁকে আসছি। দেখলাম দিনের বিশেষ বিশেষ সময়ে অন্যায় ভাবে গন্ধের অবাধ পাল্টাপাল্টি চলেছে। 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না'—এই চালু কথাটার মানে এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। কার কতটুকু পাওয়া উচিত, কোন্ মানুষ কি কি ধরণের সুযোগ ভোগ করবে, এ বিষয়ে একটা সাধারণ নিয়ম মোটামুটি সবাই মেনে চলে। এই সমাজের কাঠামো তো আর এমনি শক্ত হয়

নি। কিন্তু গন্ধের এ রকম ঢালাও কারবার চলতে দেখলে আমাদের নিজেদের সম্পর্কে সন্দেহ তৈরি হয়। যেহেতু আমার নাক একটি শক্তিশালী মাধ্যম, যার সাহায্যে আমি বস্তুর গন্ধের সু এবং কু এই দু ধরণের নির্দিষ্ট ধারণা পেয়ে যাই। যেহেতু এই এই সুগন্ধ একমাত্র ভদ্রসন্তানের এক্তিয়ারভূক্ত এবং সঠিক চিনিয়ে দেয়। সুতরাং রতন দাসের ইদানীং সৌখীনতার চর্চা আমার ট্র্যাডিশনাল বিশ্বাসকে একটু ঝামেলায় ফেলেছে। একবার মনে হলো ওকে জিগ্যেস করি, সে অ্যানিহিলিস্ট কিনা। তারপর এ কথার অর্থ ও বুঝবে না এই ভেবে আমার উঁচু নাক শান্ত হলো। বাঘের গায়ের গন্ধ ছাগলের সঙ্গে মেলে না। এবং ছাগলের সঙ্গে বাঘের সম্পর্ক সোজাসুজি খাদ্য ও খাদক। নিয়মের কাঠামো এভাবেই ঠিক করা আছে সব সমাজে। এখন বাঘ যদি হঠাৎ নিরীহ ছাগলের দলে ভিড়ে গিয়ে ঘাস পাতা খেতে শুরু করে, কিংবা ছাগল মাংসের ভক্ত হয়ে ওঠে, তবে ভারসাম্য বজায় থাকে কি করে! রতনের বউ এখন সুগন্ধ সেণ্ট মাখছে। কাল হয়তো গুণ গুণ করে রবীন্দ্র সংগীত গাইবে। তারপর একদিন রতনের সঙ্গে সিনেমা হলে আমার দাদা-বৌদির পাশে গ্যাঁট হয়ে বসে পড়বে। তখন কোন মতেই আমাদের আলাদা করে চেনা যাবে না। এভাবে ভেজাল মেশানো এক জটিল শ্রেণী বিন্যাস হবে। সেই দারুণ দুর্দিনের কথা ভাবতে ভাবতে কয়েক দিন আগে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম। বাজারে ঢোকার মুখে একজনের

দেখা পাওয়া গেল যিনি আকৃতিতে আমার দাদার কাছাকাছি এবং স্বভাবে আমার মতো খাঁটি ভদ্র সন্তান। অর্থাৎ নাক নামের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তিনি সু এবং কু দু ধরণের গন্ধ আলাদা করে চিনতে পারেন। কিছু না বলে আমি ভদ্রলোকের পিছু নিলাম। একবার মনে হলো তাঁকে অনুরোধ করি রতন দাসের আসনে আঁশবঁটি আর মাছের স্তূপ নিয়ে বসতে। সেক্ষেত্রে আমার জায়গা থেকে আঁশটে গন্ধ মাখা আমাকে দেখার একটা সুযোগ পেয়ে যাই। কিন্তু এসব কিছুই না বলে নিঃশব্দে তার পেছনে লেগে রইলাম। বাজার শেষ করে তিনি বাইরে এলেন। আর তখন সেই কাণ্ডটি ঘটলো। বাজারের বাইরে ফুটপাতের ওপর ছবি আর ফুল টুল সাজিয়ে শনি ঠাকুরের থান। আমার ভদ্রলোকটি প্রণামীর থালায় ঠন্ করে পাঁচ পয়সা ছুঁড়ে দিলেন। তারপর পকেট থেকে লটারীর টিকিট বার করে পুরুৎ মশাইকে বললেন 'ঠাকুরের পায়ে একটু ছুঁইয়ে দাও না বাবা।' লেজ থাকলে গুটিয়ে ছুট দিতাম সন্দেহ নেই। তখন সেই মুহূর্তে হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চুপচাপ বাড়ি ফিরে এসেছি। যেহেতু সু এবং কু দু ধরনের গন্ধই বাছবিচার না করে ঘরে ঘরে মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়েছে, সেক্ষেত্রে দেবতার কৃপায় অলৌকিক ধনপ্রাপ্তিই আমাদের বিশিষ্ট সমাজকে মুড়িমিছরি জাতীয় সমস্যার হাত থেকে বাঁচাতে পারে কিনা, এই সব বিদ্‌-ঘুটে চিন্তা আমার মধ্যে ভিড় করে এলো। কেননা বেঁচে থাকতে গেলে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে হবে। আর সেই সঙ্গে গন্ধ

তার স্বেচ্ছাচার চালাবে আমার নাকে এটা এখন নিশ্চিত।

সম্প্রতি আমি দিন রাত্রির বেশীর ভাগ সময় বাড়িতে ঘুমিয়ে কাটাচ্ছি যাতে গন্ধ টন্ধ বিশেষ না পাই।

বাদল

বাদলকে জানতে হলে আগে অনিমেষের খোঁজ নিতে হবে এটা সবাই জানে। কেননা অনিমেষ বাদলের ঠিক উল্টো স্বভাবের। আর অন্তরঙ্গও। অনিমেষ একমিনিট চুপচাপ থাকতে পারে না। হৈ চৈ করাটা তার গায়ের মধ্যে কেউ জন্মের সময় ঢুকিয়ে দিয়েছে। অনিমেষ যে পাড়া দিয়ে হেঁটে যায় জায়গাটা ঝম ঝম করে বাজতে থাকে তখন। কিন্তু মর্নিং স্কুলের চাকরীটা চলে যাওয়ার পর বাদল যখন জোর করে হাতীবাগানের একটা বস্তি ঘরে উঠে এলো অনিমেষ তখন কিছু না বলে চুপ করে থাকলো। এটা অন্য বন্ধুদের একটু অবাক করেছে। বাদলের এরকম হঠাৎ সিদ্ধান্তে তার চুপচাপ থাকাটা স্বভাবের বাইরে। সে যাই হোক বাদল ইদানিং ইউনিভার্সিটি বা কফিহাউসে যাচ্ছে না। এমনকি পুরোমাসের মধ্যে মাত্র এক দিন রুমকিকে পড়াতে গিয়েছিলো। লাইব্রেরী বা আড্ডাতেও সে যায়নি অনেকদিন। তাতে অবশ্য পৃথিবীর কিছুই যায় আসেনি। দু'একজন ঠাট্টা করেছে 'স্নব' 'নাক উঁচু' ব্যস। কিন্তু বাদল পরীক্ষার ফিস্ জমা দেয়নি শুনে অখিলের চোখ কিরকম চকচক করে উঠেছিলো। শুধু অধ্যাপক ভট্টাচার্য একদিন

অনিমেষকে জিগ্যেস করেছিলেন 'বাদল পরীক্ষা দিচ্ছে না কেন?' অনিমেষ মাথা চুলকে বলেছে 'ও একটা পাগল স্যার।' সেদিনই বেলা একটায় কফিহাউসের নীচে দলের সঙ্গে রুমকিকে ধরেছিলো অনিমেষ। প্রশ্ন শুনে ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেছে 'দেখ গে কেরোসিনের কুপি জ্বেলে ভারচ্যু অফ পভার্টি আওড়াচ্ছে বোধহয়।' ভিড়ের মধ্যে শ্যামল ফোড়ন কাটে 'কিম্বা হরোস্কোপ চর্চাও হতে পারে।' সস্তা গোছের খিস্তি দিয়ে অনিমেষ দলে ভিড়ে গেছে।

তো বাদলের সেই বস্তির ঘরে ১৫ই এপ্রিলের বেলা একটায় হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লো অখিল-বিকাশ-মমতা-অনিমেষ আর রুম্‌কি। অনিমেষ জোর করে ধরে এনেছে। তখন বাদল বিছানার চাদর ঢেকে গুড়িশুড়ি মেরে পড়েছিলো দেয়ালের দিকে। বেশ ক'দিন থেকেই ঘুষঘুষে জ্বর। গেলো রাতে একটু বেশি ধকল গেছে। নটার ভোঁ বাজলে বাসিমুখেই গায়ে জামা দিয়েছিলো। গলির মুখে একভাঁড় চা খাওয়ার ইচ্ছে। কিন্তু মাথাটা ঘুরে যেতেই সটান শুয়ে পড়েছে বিছানায়। তারপর উঁচু নীচু পাথর ছড়ানো জমির উপর হোঁচট খেতে খেতে একসময় মানুষের গোলমালে আচ্ছন্নভাব কাটলো তার। শুনতে পেলো অনিমেষ ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছে—'এখনো ঘুমুচ্ছিস্ কিরে শালা!'

বাদল উঠে বসে সবাইকে দেখলো ভাল করে।

'খাটেই বোস সবাই।'

'কেসটা কি তোর? পরীক্ষা দিবি না ঠিক আছে। আড্ডা কি দোষ করলো?'

বাদল পাঁচ দিনের না কামানো দাড়ি চুলকালো।

'শরীরটা ভালো নেই কয়েকদিন।'

অখিল টেবিলের বইগুলো ঘাঁটছিলো একটা বই তুলে নিলো।

'ত্ব একদিনেব জন্য দেবেন?'

'ওটা রুমকির জন্য। নোট লিখবো ভেবেছিলাম।'

বাদল ফ্যাকাশে হাসে।

বিকাশ ততক্ষণে ধপ করে তক্তপোষের উপর বসে পড়েছে।

'বললুম আমার হোষ্টেলে আয়। এখানে মানুষ থাকে!'

মমতার গলায় অনুযোগের ঢং।

'বাদলবাবুর বোধহয় আমাদের আড্ডা ভালো লাগছে না।'

শুধু রুমকি তাচ্ছিল্যের মতো মুখ করে কিছু বললো না। ততক্ষণে পশ্চিমের জানলা দিয়ে একটুকরো রোদ উঁচু নীচু মেঝের উপর ছিটকে এসেছে। তাকে অনুসরণ করে রুমকি যা যা দেখলো তা এইরকম। একটু খুঁজলেই মেঝেতে ত্ব একটা ইত্বরের গর্ত পাওয়া যাবে। বাঁশের খাঁচার উপরে মাটি লেপে দেয়াল খাড়া করা। মাথায় টিনের চাল হুমড়ি খেয়ে আছে ঘুপসি ঘরের মধ্যে। জং ধরে গিয়ে 'দ'-এর মতো। দক্ষিণের দেয়াল বাইরের দিকে একফুট মতো হেলে গেছে। দরজার পাশে পূবদিকে মুখ করে পা-বেঁকা টেবিল। টেবিলের উপর নীচে আর দেয়াল ঘেঁষে

মাটির উপর বই আর কাগজের পাহাড়। সাতটা শূন্য মাটির ভাঁড়। শালপাতা পাঁউরুটির দোমড়ানো কাগজ। এলোমেলো ছড়ানো বিড়ির টুকরো। খাটের উপর ওয়াড়ছাড়া তোষকের একধার ফেটে বিবর্ণ তুলো বেরিয়ে এসেছে। এইসব খুঁটিয়ে দেখার পর রুমকির নজরে এলো খাটের উপর ময়লা চাদর গায়ে জড়িয়ে সার্কাসের ক্লাউনের মতো বাদল বসে আছে। ততক্ষণে হৈ হৈ করে উঠলো অনিমেষ।

'গোটা কয়েক টাকা ছাড় দিকি, আজ পয়লা বৈশাখ না?'

বসে থাকতে খুব কষ্ট হচ্ছে এরকমভাবে কথা বললো বাদল।

'কোথায় যাবি?'

'দর্পণা-হিন্দ্-মেনকা, জ্যোতি বনে জোয়ালা।'

'বোম্বাই ভদ্কা।' বিকাশের টিপ্পনী।

'ড্রয়ারে আছে কিনা দেখ।'

বাদলের তখন খুব ইচ্ছে করছিলো শুয়ে পড়তে। গা গুলিয়ে উঠেছে এরকমভাব শরীরের মধ্যে। কিন্তু সে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করলো। তখন অখিলের বই দেখা শেষ হয়েছে। আর মমতা বিকাশের মুখে চেয়ে কিরকম উসখুস করলো। বাদল বুঝতে পারছিলো এই খুপড়ি ঘরের বন্ধ হাওয়ায় ওদের হাঁফ ধরেছে। রুমকি কিছুই হয়নি এরকম মুখ করে চেয়ে আছে। এদিকে অনিমেষ ততক্ষণে ড্রয়ার ঘেঁটে কালো কালো তিনটে নোট বের করেছিলো। এখন একটা নোট আবার ড্রয়ারে ঢুকিয়ে ফিরে তাকালো।

'তুই তাহলে ঘরেই থাকবি ?'

'বোধ হয় জ্বর এসেছে আবার। মোড়ের দোকানে একভাঁড় চা বলে যা।'

বুকের মধ্যে হাওয়া আটকে আসছে এরকম ভাব নিয়ে বাদল শুয়ে পড়লো। মুখ তেঁতো লাগছে। লম্বা শ্বাস নিতে নিতে জিভে টোকা দেয়ার শব্দ করলো। একবার ভাবলো দাঁত মেজে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে আসি। তারপর পাশ ফিরে শুলো। পাশের খুপরিতে গান হচ্ছে ট্র্যানজিস্টারে। মান্না দের গলা। একটা কাক ডাকলো জানলার বাইরে। প্রায় আঠাশ ঘণ্টা একটানা শুয়ে আছে সে। অনেক কাজ বাকি। আচ্ছা হিসেব করি এই ভেবে বাদল আঙুল গুণতে থাকে।

১। মানিকতলার ট্যুইশান বাড়িতে খবর দেয়া।

২। কিছু খাওয়া দরকার।

৩। ঝুলটুল ঝেড়ে সাফ করতে হবে ঘরটা।

৪। লাইব্রেরীর বইদুটো ফিরিয়ে দেয়া হলো না।

৫। রুমকির নোট লেখা বাকি এখনো।

এখানে এসে বাদল রুমকির কথায় চলে গেলো। কবে লেখা হবে ঠিক নেই, ওর পরীক্ষা এসে যাচ্ছে। দূর ছাই, পারছি না বলে দিলেই হতো। রুমকির গায়ের রং এতো কালো কেন ? ছোটবেলায় মাকে যে রকম দেখেছি। সাদা থান পরণে প্রদীপ শিখার মতো জ্বলতো দিন রাত। মাকে দেখলেই মনে হতো এক্ষুণি স্নান করে এলো। কতদিন

দেখিনি মাকে। আমার মনে আছে ন'বছর বয়সের সময় একদিন অনেক রাতে লোকজনের গোলমালে ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো। দোতলার রেলিঙে ঝুঁকে দেখি নীচের উঠোনে আলো জ্বলছে। ঝড়ের মতো মুখ করে লোকজনেব চলাফেরা। কে যেন আমাকে অন্ধকার ঘরে টেনে নিয়ে গেলো। কানে কানে ফিস ফিস করে বললো 'তোর মা গায়ে আগুন দিয়েছিলো হাসপাতালে নিয়ে গেছে।' আমি বলেছিলাম 'কেন ?' সে চুপি চুপি বলছিলো 'একজন তোর মায়ের গায়ে হাত দিয়েছিলো তাই।' আমি বোকার মত বলেছিলাম 'তাতে কি ?' মায়ের সেই আগুনে ঝলসানো শরীর কেউ আমাকে দেখতে দেয় নি। বাড়ির সবাই এড়িয়ে যেতো। রুমকিকে দেখলে মায়ের সেই প্রদীপ শিখার মতো রূপ মনে পড়ে। বাদলের খুব ইচ্ছে হলো এক্ষুণি রুমকির সঙ্গে কথা বলে। তা সে তো সিনেমায় গেছে ওদের সঙ্গে। কিন্তু যদি না যায় ? বাদল সিদ্ধান্ত নিলো চট করে। শরীর খুব দুর্বল। বেশি দেরি করা চলবে না!

লেক স্টেডিয়ামে নেমে বাদল রুমাল দিয়ে মুখ মুছলো। পথে মানুষের ভিড় আজ একটু বেশি। নতুন বছরের ফুর্তি করতে বেরিয়েছে সবাই। দোকান-টোকানগুলো দারুণ সাজানো। বাড়িগুলো মড্ আর্কিটেচারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তৈরী। এপাড়ার দোকানে হালখাতা হয় কি না বাদল জানে না। তবে দেখে মনে হয় এদের রোজই উৎসব। একটা তিনতলা ব্যালকনীর ফ্রেমে চকচকে রাজপুত্তুরের পাশে

ম্যাক্সি পরা রাজকন্যা আইসক্রীম খাচ্ছে। বাঃ বেশ। ওদের পাশে এয়ার ইণ্ডিয়ার মহারাজাকে দাঁড় করিয়ে দিলে বেশ জম্পেশ হতো ছবিটা। বাদল কব্জী উল্টে ঘড়িতে দেখলো পৌনে তিনটে। মেনকার শো শুরু হয়ে গেছে। তাহলে তো ওদের আর পাওয়া যাবে না। কোথায় যাওয়া যায় এবার এই ভেবে বাদল লেকের দিকে এগোলো। একবার ভাবলো হেঁটে কি লাভ। তারপর চলতে থাকলো। একটা ডবলডেকার রাস্তা কাঁপিয়ে গোলপার্কের দিকে চলে গেলো। মাথার উপরে ঈগল পাখির মতো ডানা ঝাপটে গেলো হাওয়া। বাদল সে সব গ্রাহ্য করলো না। খুব ভিড় আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। একটা বেঞ্চিও খালি নেই কোথাও। জলের ধারে ঘূরপাক খাচ্ছে লোকজন-কাচ্চাবাচ্চা-প্রেমিক-প্রেমিকা-ফুচকা-আলুকাবলি-দইবড়া। কোথায় যে থাকে এত সব। কেমন ঘোলাটে বৈশাখের আকাশ। লেকের জলে রং পড়েছে আকাশের। ভিড় এড়িয়ে একটু দূরে চলে গেলো বাদল। সরোবরের এপাশটা একটু নির্জন। ছায়া ছায়া। দু একজন কপালে হাত রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে ঘাসের উপর। আর কিছু নেই। শেষ দুপুরের ঝিম ধরে আছে জায়গাটায়। জল ছুঁয়ে ফুরফুরে হাওয়া আসছে। তখন হঠাৎ বাদলের ইচ্ছাপূরণ হলো। অবাক হয়ে দেখলো জলের দিকে মুখ করে চুপচাপ বসে আছে রুমকি।

‘এই যে তুমি এখানে, আর আমি তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।’

রুমকি তেরছা ভাবে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকালো।

'কেন ?'

'বাঃ অনেক কাজ বাকি আছে যে ?'

মুখ ফিরিয়ে দক্ষিণ দিকে তাকালো রুমকি।

'বৃষ্টি নামবে মনে হচ্ছে।'

'হোক, খুব বৃষ্টি হয়ে ধুয়ে যাক সব।'

বাদল পা ছড়িয়ে দিলো জলের দিকে ঢালু মাটিতে।

'তুমি এতো কালো কেন রুমকি ?'

'কালো অন্ধকারের রঙ জানো না !'

বাদল ছটফট করে কিরকম।

'অন্ধকারের মধ্যে দাউ দাউ আগুন জ্বললে কি দেখতে খুব ভয় করে ?'

রুমকির দিকে চোখ রেখে বাদল হঠাৎ বাচ্চা ছেলে হয়ে যায়।

'আমার খুব ইচ্ছে করে তোমার বুকে মাথা রেখে একটু ঘুমোই।'

'তাহলে ঠোঁটে করে খড়কুটো নিয়ে আসি।'

এই বলে মুচকি হেসে উঠে দাঁড়ায় রুমকি।

'আঃ শোনো না। আমার আরো ইচ্ছে করে অনেক কিছু খাই। প্রায় তিন-চারদিনের উপোষ আমার বুঝলে।'

কিন্তু রুমকি ওর কথা শোনার জন্য দাঁড়িয়ে রইলো না। বাদল দেখলো ঘাসের উপর দিয়ে হালকা পায়ে এগিয়ে

যাচ্ছে রুমকি। তারপর ঘাস পেরিয়ে পীচের রাস্তায় হেঁটে গেলো সটান। আর বসে থাকার কোনো মানে হয় না। ওর চলা অনুসরণ করে তার নজরে এলো রাসবিহারী অ্যাভেন্যুর দিকে মিছিল যাচ্ছে। শ্লোগান নেই। চিৎকার নেই। ট্র্যাফিক জ্যাম নেই। শুধু পনোরো কুড়িজন মানুষ রঙচঙে পোস্টার হাতে চুপচাপ হেঁটে চলেছে। এ কেমন মিছিল ভাবতে ভাবতে বাদল রাস্তায় নেমে এলো। 'কাঁচাগোল্লা খেতে চাই'—'ভুতের রাজার বর চাই'—'ডিগবাজী খাওয়া চলবে না চলবে না'—'ফুচকার দাম কমিয়ে দাও।' বাঃ দারুণ ব্যাপার! বাদল টুক করে মিছিলে ভিড়ে গেলো। কিন্তু মিনিট তুয়েক পরেই তার মনে হলো কিছু একটা করা দরকার। ঠিক তখন সরু মুখ দাঁত উঁচু একটা চারপেয়ে জীব গুটিগুটি পায়ে তার সামনে এসে দাঁড়ালো। বাদল চিনলো ওর নাম নেকড়ে। সেই বিকট মুখ আর কুতকুতে চোখের দিকে চেয়ে সে জিগ্যেস করলো—'কি করি বলো তো, খুব খিদে পেয়েছে।'

তখন রাস্তার বর্ণনা দাঁড়ালো এইরকম। লোকজনের ভিড় কাটিয়ে নেকড়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর বাদল চারহাতপায়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলেছে তার পিছু পিছু। খোলা রাস্তায় এরকম সার্কাস খুব একটা দেখা যায় না। তাই রাস্তা ফাঁকা হয়ে তুদিকের ফুটপাতে ভিড় জমে গেলো খুব। কিন্তু বুনো জন্তু গ্রাহ্য করলো না ওসব। বরং আর একটু এগিয়ে একটা ব্রেকডাউন বাসের সামনে দাঁড়িয়ে

চুপচাপ লেজ নাড়াতে থাকলো। অনেকক্ষণ বেওয়ারিশ পড়ে আছে সেটা। নেকড়ের ইশারায় বাদল বিকট চিৎকার করে বাসের সামনের দিকটা কামড়ে ধরলো। ড্রাইভার-কণ্ডাকটারের কোনো পাত্তা নেই। দু-চার মিনিট পর বাসের মাডগার্ডটা কড়মড় করে চিবোতে চিবোতে ফোঁস ফোঁস শ্বাস ফেলছিলো সে। কিন্তু জঙ্গলের প্রাণীটি একটুও সময় দিতে রাজী না। সাদার্ন অ্যাভেন্যু আর রসা রোডের মোড়ে পাতাল রেলের বিশাল ক্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে। তার সামনে গিয়ে গলার মধ্যে দুবার 'ঘোঁ ঘোঁ' শব্দ করতেই বাদল চার হাত পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে কামড় বসালো ক্রেনের গায়ে। এরকম আগুনের মতো খিদে তার আগে কোনদিন পায়নি কেন? উঃ গায়ের মধ্যে রি রি করছে বাদলের। পেটের মধ্যে তুলকালাম কাণ্ড। মুখের চোয়াল শক্ত হয়ে দাঁতের ফাঁক দিয়ে লালা ঝরছে। তার নাকের ফুটো এখন বেলুন আর চোখে খুনের রং মাখানো। মাথার চুল সজারুর কাঁটা। এরপর আর কোন জন্তু টন্তুর দরকার হলো না। উপোষী বাদল খাবারের খোঁজে দিক বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটতে শুরু করে। সেই সময় রাসবিহারীর মোড়ে ট্রাম-বাস-ঠেলা-মিনি-মানুষ পাতাল রেলের গর্ত টর্ত বন্যার জলের মতো পাক খেয়ে ছুটে যাচ্ছিল। বাদল কাউকে থাবার আঘাতে ছুঁড়ে দিলো। কারুর গলায় হিংস্র দাঁত বসিয়ে দিলো। ধারালো নখে ছিঁড়ে ফেললো কারোর বুক পিঠ। পায়ের নীচে পিষে চ্যাপটা হয়ে গেলো

কারুর নরম শরীর। সেই ছুটন্ত বুনো দানবকে দেখে লোকজন চিৎকার করে পালিয়ে যেতে থাকলো। একটা তিন বছরের বাচ্চা ভয় পেয়ে কেঁদে উঠলো কোথাও। ভিড়ের মধ্য থেকে অনিমেষ হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো 'বাগ্‌ আপ্‌, বাদল বাগ্‌ আপ্‌।' সেই দারুণ জয়ের আনন্দে ভেসে যেতে যেতে বাদল ঝাপসা দেখতে পেলো সামনে পিছনে দুটো লোক তাকে স্ট্রেচারে করে বয়ে নিয়ে চলেছে। আর তার পাশেপাশে হেঁটে আসছে কালো পাড় হলুদ শাড়ী পরা ঝুমকি। তখন বাদল বাচ্চা ছেলের মতো মুখ করে বলে উঠলো, 'মা আমি শোধ নিয়েছি তোমার।'

সকাল পেরিয়ে

জেগে উঠলেই যেন খুব সকাল হোলো এইরকম। বাইরে ভিতরে চারিদিকে। অথচ আমাদের বাড়ির কাছে না ছিল খোলা মাঠ, না ছিল গাছগাছালির ভিড় টির। পাতার ওপর টুপটাপ শিশিরপাতের শব্দ হোতো না, কিংবা রাতজাগা তিতির পাখির টিট্‌-টি-র-র্‌-র্‌ ডাক। এসব ব্যাপারে আমি খুব সজাগ ছিলাম তখন। কোন কিছুই আমার নজর এড়িয়ে যেত না। যেমন আমি জানতাম সুপ্রতিবেশী বিনয়বাবু থলি হাতে রেশনের দোকানে যাচ্ছেন, গলির মুখে টিউবকলের সামনে পাড়ার ভিড় ক্রমশ দানা বাঁধছে, এবং আমার মা এইমাত্র উনুনে আগুন দিয়ে স্নানের ঘরে গেল। আসলে খুব অনায়াসে আমি এসব ভেবে নিতে পারতাম নিজের খেয়ালখুশিমত। ঠিক যেন হালকা পায়ে শিস দিতে দিতে সিনেমায় ঢুকে পড়া। পর্দায় যখন রাত হয়েছে আমার তখন ফুটফুটে সকাল। কেননা প্রেমিকা তখন হঠাৎ মাথা নামিয়েছে আমার কাঁধে। ওর রুক্ষ সোনালী চুল আমার মুখ ছুঁয়ে যাচ্ছিল বার বার। আস্তে আস্তে গাল ঘসছিল আমার কাঁধে। আর চুপচাপ বয়ে যায় ঠাণ্ডা হাওয়া।

দশদিকে ওর গায়ের নিবিড় গন্ধ ছুটে যায়। শরীর শিরশিরিয়ে ওঠে আমার। আমি পাশ ফিরে ওর নরম সরের মত মুখখানা ছু'হাতের মধ্যে তুলে নিলাম। চালাক পরিচালকের ইশারায় ঠিক তখন সিনেমায় আকাশভরা চাঁদ উঠলো। সাদা ধবধবে জ্যোৎস্নায় খোলা মাঠ বৃষ্টির মত ভিজতে থাকে। কোথাও কেউ নেই এখন। রাধাচূড়ার গায়ে হিমের আস্তরণ সারারাত। পেঁচার ডাক। শুধু হাওয়া বয় এলোমেলো। মাঘের কনকনে ঠাণ্ডা নিয়ে চরাচরে ঘন হয়ে উঠেছে রাতশেষের কুয়াশা। একা একা। নির্জন মাঠের উপর ঝাপসা পাণ্ডুর রঙ নিয়ে চুপিচুপি নেমে আসছে এক ফুটফুটে সকাল। আমার ঘরের বাইরে আকাশ জাগতো সোচ্চারে। মানুষের তাড়াতাড়ি হেঁটে যাওয়া। টিউবকলে ব্যস্ততা। কে যেন নেয়ে উঠলো আপাদমস্তক।

শাস্ত্রমতে প্রেমিকার নাম থাকা উচিত। সে কিনা প্রগাঢ় যুবতী কলাপটু। কারণে অকারণে তার শরীরে ছন্দ জাগে, চোখে বিভাব অনুষঙ্গ। ধরা যাক তার নাম শ্রীলতা, মিনতি, ছন্দা, কিংবা কুসুম বা বলাকা। এর যে কোন একটা নামে ডাকলে তার নায়িকালক্ষণগুলো বিশেষ ছাঁচের প্রতিকৃতি নিয়ে ফুটে উঠবে। আমি তাকে কখনো একনামে ডাকি নি। সকালের নেশায় আমার তখন বিষম দশা। চারিদিকে রঙ ফোটে। পিচকিরি দিয়ে রঙ ছিটোয় হাওয়া, মাটি, জল, রং খেলে ডিহি পাহাড় আর বনস্পতি।

তার অনেক আগে শহরে খুব বৃষ্টি নেমেছিল একদিন। হতে পারে আষাঢ় কিংবা শ্রাবণ মাস। অথবা ইচ্ছেমত যে কোন সময়। সাল তারিখের হিসাব নিয়ে কে মাথা ঘামায়। তো সেই ঝম ঝমে বর্ষার মধ্যে বন্ধু সুললিত জোর করে ঢুকেছিল এক কোঠাবাড়িতে আমার বাধা না শুনেই। তারপর মাসীমা-সুকু-মহারাণি এইসব নামে মুহুর্মুহু চেঁচিয়েছিলো। দোতলার সেই ঘর, সেই বিড়ালমুখো ঝুলন্ত ফুলদানী, ক্রুশবিদ্ধ নিষ্পাপ মানুষ, আর প্রেমিকার ভারী আবির্ভাব। সেই সকাল হলো। মনে হোলো আড়াল থেকে কে যেন খুব মজার মত মুখ করে সেলাইকাঠি নিয়ে বুনতে বসল। সুললিত আমাকে সাবধান করেছিল একদিন। আমি শুনিনি। তখন আর সময় নেই, তখন আমার নিজস্ব পদ্ধতিতে নক্সা এঁকে বসে আছি। ঝকঝকে কোঠাবাড়ি, নম্র যুবতী, ঘুম, পাতাবাহার, স্বাস্থ্যময় সকাল, সেই ফুটফুটে সকাল। কবে যেন মেয়েরা যুদ্ধযাত্রার স্তব শেষ হলে যজ্ঞভুমি থেকে অগ্নির গান গলায় নিয়ে ঘরে ফিরতো, কিংবা ঝাউবনে হাওয়ার শব্দ উঠতো তুমুল। এবং এসব ভাবনার স্তর আমি অক্লেশে পেরিয়ে যেতাম খুশিমতো। আমার সেই পরিচিত খোলামাঠ আর রাধাচুড়া বৃক্ষলতা চাঁদের আলোয় সারারাত ভিজতো সকালের অপেক্ষায়। আমার প্রেমিকার ঠোঁটের ওপরে একরত্তি একটা তিল যেন ভোরের আগে অন্ধকারের প্রতীক হয়ে ফুটেছিল। বাচ্চা ছেলের মত মজা করে আঙ্গুল দিয়ে ছুঁয়ে

দেখতাম অন্ধকার। ঢং করে কথা বলতো না প্রেমিকা। শুধু মুখ দিয়ে সুখের মত 'উম্' 'উম্' শব্দ করতো। তখন আর খুব বেশি হাতে নেই। ঘড়িতে তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। সুললিত আমাকে সাবধান করেছিল। আমি শুনিনি। আমার কারিগরী দক্ষতার ওপর আস্থার অভাব ছিল না। আসলে আমি সচেতনভাবে প্রেমিকাকে জাগাতে চাইতাম। প্রেমিকার বুকের ভিতরের পাখিটাকে। যার চোখের উজ্জ্বলতা কোন পরিচিত চেহারায় নেই। যার খোঁজে অনেক দিনরাত্রি ঘুরে বেড়িয়ে এমন কি স্বপ্নের মধ্যেও দেখতে পাই নি কোনদিন। নিভৃতে একদিন প্রেমিকাকে বলেছিলাম একথা।

বলতে ভুলে গেছি প্রেমিকার বাবা সরকারী বনবিভাগের কর্মী। তখন হাজারীবাগের সংরক্ষিত অরণ্যে বদলী হয়েছেন। সেই সূত্রে আমার কদিনের বেড়াতে আসা। এখানে নাকি পাখিদের অনেক রেয়ার স্পেসিমেন দেখা যায়। সে যাইহোক বনপথে হাঁটছিলাম দুজনে। এখন প্রেমিকা হাসেন সেসব পুরোনো কথা শুনে। কিন্তু বয়স আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যায় দূরের কাছাকাছি। তো ঘটনাটা আসলে এই সুললিত সুযোগ করে দিয়েছিল আমাদের। প্রেমিকার বাবা-মাকে পাশের গ্রামের এক প্রাচীন মন্দির দেখতে নিয়ে গিয়েছিলো। তারপর একসময় সেই নির্জন বনে সূর্যাস্ত হোলো। আর একটি দুটি করে তারা মাথার উপরে হেঁটে আসতে থাকলো। প্রেমিকা আমার ডান পাশে হাঁটছিল। আমি শক্ত করে ওর হাত

চেপে ধরে। হঠাৎ দমকা হাওয়া বইলো জঙ্গলে। পাতায় পাতায় ধাক্কা লাগার শব্দ হোলো। বুনো ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ। আড়াল দিয়ে দারুণ বেগে ছুটে গেল হরিণের পাল। আমি দ্রুত পাশ ফিরে যুবতীর কানে কানে সেই উজ্জ্বল চোখ পাখির কথা বললাম। তখন অদ্ভুত যত ব্যাপার ঘটতে লাগলো চারপাশে। প্রেমিকা টলমল করে কেঁপে উঠে ক্রমশ বদলে যেতে থাকলো। প্রথমে ঠোঁট, তারপর চোখমুখ এবং শরীর পালকময় ক্রমশ দীর্ঘচঞ্চু এক পাখির আকারে উদ্ভাসিত হোলো। চোখের সামনে এক টুকটুকে লাল ঠোঁট বনটিয়া উজ্জ্বল ডানা মেলে উড়ে এলো আমার দিকে। আমি বুঝলাম সবদিকে বিরাট পরিবর্তন আসন্ন হয়ে উঠেছে। আমার পায়ের তলায় মাটি কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকলো। মেঘের গর্জন। খুব তাড়তোড়ি শান্ত অরণ্য জেগে উঠছে। আমি পাখিকে বুকে নিয়ে পাগলের মত ছুটতে লাগলাম। আমার চারদিকে গম্ভীর আওয়াজে মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছিল। এইবার পৃথিবীগর্ভ থেকে ফুটন্ত লাভা উঠে এসে আমাদের ঢেকে দেবে। আমরা এক্ষুণি পাথর হয়ে যেতে পারি এই ভেবে আমার খুব ভয় হোলো। আমি এখন কোথায় যাব? জঙ্গলের কোন অঞ্চলে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজি পাখির জন্য আমার জন্য? এইভাবে এক প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছে আমার ভিতরে মাথা তুলে দাঁড়ালো। অদ্ভুত এক কর্কশ গলায় 'ভূমিকম্প' বলে চিৎকার করে আমি পাখিকে বুকে নিয়ে পাশের ঝোপের

মধ্যে লাফিয়ে পড়লাম। তারপর গভীর ঘুম এলো। মাথার ওপরে দ্রুত পরিবর্তন ঘটে চললো সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে। স্বপ্নে দেখলাম জীবকোষের বিবর্তন। একটি অ্যামিবা প্রাচীন নিয়মে বিভক্ত হয়ে দুটি হোলো। এইভাবে লক্ষ্য জীবকোষে কোটি অ্যামিবার জন্মের পর এলো পশুজগৎ। ডানা গজানো পশু ডিম পাড়লো। ডিম ফুটে বেরোলো একরত্তি বাচ্চা। বাচ্চা একদিন পাখি হয়ে ফুরুৎ করে উড়ে গেল শূন্যে। স্বপ্ন দেখা শেষ হলে আমি জেগে উঠলাম। শুয়ে শুয়ে দেখলাম পৃথিবীর রূপান্তর আপাতত শেষ হয়েছে। এখন আমার চারপাশে ভিড় করে আছে প্রেমিকার ক্লান্ত অন্ধকার মুখ, আকাশের তারার ফুটকি, জোনাকী পোকার আগুন, আর ঝোপঝাড়ের কালো ছায়া। একসময় বন পেরিয়ে আমরা ঘরে ফিরলাম। আমাদের দেখে ওর বাবা-মা-সুললিত হৈ হৈ করে উঠলো। যেন কিছুই ঘটেনি এরকম মুখ করে আমি ওদের সঙ্গে সারনাথের বৌদ্ধস্তুপ নিয়ে আলোচনা করলাম। কে কবে অদম্য করুণায় জমাট অন্ধকার অক্লেশে পার হয়েছিল তার গল্প আমি ওদের শোনালাম। এসব অনেক আগের কথা। তখন আস্তে আস্তে আমার মধ্যে একটা পরিণতি আসছে। একটা বোধ অস্পষ্ট চেহারার মত উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে। যার চোখ অবিচল সেই পাখির মত উজ্জ্বল। যার খোঁজে অনেক দিন রাত্রি ঘুরে বেড়িয়ে সবে আজ স্বপ্নের মধ্যেই শুধু একবার।

তা সে যাই হোক স্থূল অর্থে এটা খুব হাসির ব্যাপার মনে হবে। যে মানুষ দশটা পাঁচটা অফিস করে, দুআনা চার আনা জমিয়ে একবছর পর বউয়ের টিকলী গড়িয়ে দেয়, সে তো নির্ঘাৎ পাগলামো বলবে। কিন্তু সে কি জানে কি চায়! এই যে অসংখ্য মানুষ হাঁসফাঁস করে ছুটে চলেছে কিসের উদ্দেশ্যে! কেউ কি জানে কিসের দিকে তার এগিয়ে চলা! এই এক বোধ তখন একটু একটু করে আমার ভেতরে সেই পরিণতি নিয়ে আসছে। কবে যেন পুরাতাত্ত্বিকের মুখে এক কিংবদন্তির জন্ম হয়েছিল। বাঁক ফিরলেই বিস্মৃত উপত্যকা, ভাঙা খিলান, রুক্ষ পাথরে প্রাচীন গাছের দাগ, গুহালিপি, ইতস্তত নামাঙ্কিত ধাতুমুদ্রা। ঘণ্টা বাজতেই কারা দ্রুত হেঁটে গেল মন্দিরে। শুদ্ধ কণ্ঠে প্রার্থনা ধ্বনিত হোলো গম্ভীর। তারপর একদিন চারদিকে ভিড় করে এলো ধূসর শীত। গাছপালা অস্থিরতা থামিয়ে শান্ত হোলো। গেরুয়া রঙের ছোপ লাগলো মাটির গায়ে। আর খুব নীল হোলো জলের দাগ। আমি কদিনের জন্য পাহাড়তলীর ডাক পেলাম। এখানে হাড়কাঁপানো উত্তুরে হাওয়া বয় ছক বাঁধা নিয়মে। ছাইরং ডিহি পাহাড় উদাসীন চুপচাপ। আমি এলোমেলো ঘুরে বেড়ালাম খোলামাঠে ভাঙা পাথর ডিঙিয়ে। মাঠ পেরিয়ে গিরিপথে। নদী উপত্যকায়। ইচ্ছেমত যাকিছু কুড়িয়ে নিতে আমার বেশ লাগছিল। একটা নীল রঙা পাখি অনেক উঁচু দিয়ে উড়ে যেতে গিয়ে পালক খসে পড়লো। আমি

কুড়িয়ে নিলাম কোন কারণ নেই। পাথুরে মাটিতে কোথাও বুনো ঝোপ গজিয়েছে। একটার মূলশুদ্ধ উপড়ে নিয়ে থলিতে ভরলাম। আসলে এটারও দরকার ছিল না কিছু। শুকনো নদীখাতে অদ্ভুত আকারের একটা পাথর পাওয়া গেল। হয়তো পৃথিবীর বয়স মাপতে সাহায্য করবে, তাই। এইরকম উদ্দেশ্যহীনতার মধ্যে কিরকম একটা রহস্য থাকে আমার মনে হয়। একদিন আমার বিচিত্র সংগ্রহ নিয়ে নদী পেরোলাম, মাঠ পেরোলাম, পাহাড়ে উঠতে শুরু করলাম। চড়াই পথে পাথর টপকে উঠতে গিয়ে খুব লম্বা শ্বাস নিতে হচ্ছিল। কিছুটা বসে কিছুটা চলে আমি অবিরাম উঠতে লাগলাম। বেলা পড়লে অবশেষে অনেক উঁচুতে এসে হাওয়া ঘন এবং শীতল হোলো। পিছন ফিরে সেই নদী উপত্যকা অনেক নিচে তলিয়ে গেছে দেখলাম। প্রায় এসে গেছি এই ভেবে একটা পাথরের চাঁইয়ের ওপর বসতেই ভীষণ শীত বোধ হোলো। কি হোলো হঠাৎ এই ভেবে ঘাড় ফিরিয়েই ঘন কুয়াশা দিগন্ত ছড়িয়ে আমাকে ঢেকে ফেললো। এই অন্ধকারে সময় খুব কম পাওয়া যাবে আমি বুঝলাম। ঠিকসময়ে অন্যদের মত আমাকে নেমে যেতেই হবে। একথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে দুঃসাহসিক পুরাতাত্ত্বিকের মত আমি বুকে হেঁটে এগিয়ে গেলাম। ততক্ষণে কুয়াশা আরো পুরু হয়ে আমাকে প্রায় ঢেকে ফেলেছে। আমি কিছুই হারাতে না পারার লোভে পাগলের মত পাথরে গা ঘসে ঘসে সেই বিস্মৃত উপত্যকার দরজায় এগিয়ে গেলাম।

হঠাৎ ঘণ্টাধ্বনি হতেই গুহামুখ হাট করে খুলে গেল। অবাক হয়ে দেখলাম কারা যেন প্রেমিকাকে নিয়ে খালি পায়ে মন্দিরে হেঁটে গেল। শুধু গলায় গম্ভীর ধ্বনিত হোলো প্রার্থনা। মেঘের ডাক। আমার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠায় ক্লান্ত আমি পাথরে মাথা রেখে চোখ বুজলাম। সিসিফাসের পাথরের মত এবার আমি গড়িয়ে যাবো নীচে উপত্যকার দিকে।

তারপর আবার।

কাল সন্ধ্যেবেলায় শ্যামল অন্যরকম ভেবেছিলো। পা-ভাঙা তক্তপোষের উপর হ্যারিকেন জ্বলছিলো তখন। আর ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে বলে ছায়াটা দেয়ালের উপর ত্রিভূজ তৈরী করেছিলো। অবিশ্যি কাল ছিলো বছরের শেষদিন। কিন্তু তার ভাবনার স্নুতো একেবারে জান্নুয়ারি থেকে ধরা যায়। স্নুতোটা বলতে গেলে এক টুকরো ছেঁড়া ন্যাকড়ার মত। কখনো সেটা দিয়ে মুখ পুঁছছিলো, কখনো শুঁকছিলো। আসলে গোটা বছরটাই ওর এত ঘিঞ্জি লেগেছে যে ভাবতে গেলে গা ঘিন ঘিন করে ওঠে। এই রকম হলে শ্যামল খুব জোরে গা হাত-পা ঝাঁকিয়ে নেয়। তারপর ইতিহাস রাজনীতি প্রেম এইসব তত্ত্বটত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে করতে অন্যসব ভুলে যেতে পারে। যেমন কাল রাত্রে ঘুমোবার আগে ভেবেছিলো 'সকাল হলেই আমি স্নুস্থ হব, চৌরঙ্গীর পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়াবো, কুড়ি পয়সার বাদাম কিনে যতক্ষণ খুশি হাঁটবো, খেতে খেতে আমার ফুর্তি বাড়বে, আর আমি পালটে যেতে থাকবো, এমনকি একটা সিনেমাতেও ঢুকে যেতে পারি তারপর।' কিন্তু আজ বেলা সাড়ে নটায় ঘুম

ভেঙে দেখলো সবকিছুই এক রকম সাজানো। এগোরোটা পর্যন্ত শুয়ে শুয়ে শ্যামল দেখলো পাশের ঘরের রামবাবু অফিসে বেরিয়ে গেলে দেয়াল ঘড়িটা একরকম স্কেলে শব্দ করে যাচ্ছে —আর রোদ্দুর-টোদ্দুর, একেবারে মাপা কায়দায় হুটহাট সরে পড়লো।

'হাত্তেরি ছাই'—এই বলে শ্যামল লাফিয়ে পড়লো বিছানার উপর থেকে। মেঝে থেকে একরাশ ধুলো ছিটকে উঠলো ঘরের মধ্যে। শ্যামল মাথা ঘামালো না বিশেষ। গেল বছরের মাঝামাঝি তার অসুখ হয়েছিলো। এখন তার যা যা মনে হল ঠিক এইরকম। 'খুব সম্ভবত আমি সেরে উঠি নি। বোধহয় কলকব্জায় কিছু গোলমাল রয়ে গেছে তখন থেকে। নইলে সেই লাইটহাউসটা খুঁজে পাচ্ছি না কেন। এখানে ওটার ব্যাপারে একটা সংক্ষেপে ঘোষণা দেয়া দরকার—' শ্যামল পায়চারী করতে করতে বিড় বিড় করলো।

'আমি একটা লাইট খুঁজছি গৌরী, যার সবচেয়ে উঁচু গোল গম্বুজের মধ্যে আমি থাকবো। আর আমার চারপাশে দিন-রাত্তির সমুদ্র গর্জাবে। আর হাওয়া, হাওয়ার শব্দ। এবং নিশ্চয়ই সেটা কাছাকাছি কোথাও আছে।'

এই কথাগুলো বলতে বলতে শ্যামল দাঁত মাজাটাজা পেচ্ছাব এইসব চালিয়ে গেলো ঠিকঠাক। যেসব জিনিস তার ভালো লাগে না তার মধ্যে এক নম্বর হল বাইরে বেরনো। কোলকাতার লোকসংখ্যার কথা ভাবলেই তার পায়ের নখ

থেকে মাথার চুল পর্যন্ত ঘিন ঘিন করে ওঠে। শ্যামল ভাবতে গিয়ে সম্প্রতি আবিষ্কার করেছে জীবনের সবচেয়ে মহৎ কাজ চুপ করে শুয়ে থাকা। গতি মানে এক নাগাড়ে ক্ষয়ে যাওয়া। এই সিদ্ধান্তে সে পৌঁছেচে আরশোলাকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে সরে আসতে দেখে। এছাড়া শামুক গাছপালা আর কচ্ছপকেও মোটামুটি এই দলে ফেলা যায়। শ্যামল ডানদিকে উঁকি মারলো একবার। টিনের বেড়াটা এক পাশে হাঁ-করে আছে। একটা বেওয়ারিশ গরু কাণ্ডটি ঘটিয়েছে। শ্যামল বিরক্ত হল এই ভেবে, যেন তুনিয়ায় লোককে রাস্তা দেখানোই তোমার শিং তুটোর কাজ। কেউ কেউ বলে সে নাকি আত্মকেন্দ্রিক। কথাটা অবাক হবার মত কিছু না। একটা অস্পষ্ট ঘটনা মনে পড়লো তার। আমার স্মরণশক্তি খুব খারাপ নয় তাহলে, এই রকম মুখের ভাব করে শ্যামল নিজের পিঠ চাপড়ালো।

এই বাড়ির তিনদিকে যে টিনের বেড়া দেওয়া তার পেছনে জি, টি, রোড এবং সামনের দিকে হুগলী নদী। গেল বছরের এক শীতের সন্ধ্যায় পুবের জানলা হাট করে খুলে গঙ্গার দিকে তাকিয়েছিলো গৌরী। আকাশে চাঁদটাদ ছিলো না। তবে নদীর বুকে দমকা হাওয়ার ভিড় ছিলো। আর কালির ফোঁটার মত তু' একটা খেয়া নৌকোর নড়াচড়া। শ্যামল সন্ধ্যের-একটু পরেই ফিরলো। গৌরী অবিশ্যি বেশ কিছুক্ষণ আগেই। ভেবেছিলো শ্যামল হঠাৎ চমকে যাবে। হিসেবে কিন্তু মিললো

না। কেননা গৌরী দেখলো, শ্যামল একবার তার দিকে তাকিয়ে তক্তপোষের উপর টান টান হল। শ্যামল তখন যা যা ভেবেছিলো সেটা কাগজে কলমে সাজালে এই রকম হবে।

ক) পরিবেশ এবং শব্দ কি সত্যিই মানুষকে ইনফ্লুয়েন্স্ করে?

খ) তাহলে গৌরীকে এক্ষুনি চোখ উল্টোনো মাছ মনে হচ্ছে কেন আমার? এমন কি ক্যাঙারুর বাচ্ছাও বলা যায়।

গ) গৌরীর চোখের নীচে বেশ কালি পড়েছে।

ঘ) গৌরীর মুখের ভাব একটু অবাক হবার মত।

এর পর শ্যামলের আর কিছু মনে নেই। ওপাশ-এপাশ তাকিয়ে দেখলো সে। একবার বুকের মধ্যেও নজর ফেললো। কিন্তু রবার ঘসার কয়েকটা দাগ ছাড়া আর কিছুর হদিশ পাওয়া গেল না। এখন তার মুখের ভাবভঙ্গি এই রকম হল—সেদিন গৌরীকে খুন করলেই বা কি হত। আসলে আমার দরকার লম্বা উঁচু এক লাইটহাউসের যা কিনা গৌরীর চিৎপুরের ঘিঞ্জি বাড়ির পাশাপাশি ভাবাই যায় না।

এখন শ্যামল গলির মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে। পাজামা আর গায়ের পাঞ্জাবীটা অন্যদিনের চেয়ে একটু বেশী ফরসা। সেদিকে মাথা না ঘামিয়ে বরং কোনদিকে যাবে এই নিয়ে ভাবছিলো সে। আজ অবিশ্যি ছুটির দিন। তবে বাসের ভিড়ের

কাছে রবি সোম বলে কিছু নেই। 'নকুচি করেছে তোর ইয়ের—' এইরকম বেপরোয়া ভঙ্গিতে শ্যামল বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল।

কবে যেন এখনকার এক লেখকের প্রবন্ধ পড়েছিল শ্যামল ঃ তার মতে নিজের সম্বন্ধে কিছু ভাবতে গেলে জনৈক বন্ধু হয়ে যেতে হবে।

'এটা আমাদের নিজেকে ঠকানো ছাড়া আর কিছুই না'— শ্যামল ঠোঁটের ফাঁকে মুচকি হাসলো।

'কালকেই আমার এক বন্ধু বলেছিলো আমি নাকি সায়েন্স এজ্-এর শিকার হয়ে যাচ্ছি। এ সম্পর্কে আমার স্বপক্ষে যা যা বলতে পারি তা হল ঃ

১। আমি একটা দারুণ উঁচু লাইটহাউসের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরছি, যার চারপাশে শুধু সমুদ্রের ঢেউ, আর হাওয়া, হাওয়ার শব্দ।

২। আমার জানা চেনা জায়গার মধ্যে তার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

৩। আমার নাক চোখ ইত্যদির সাহায্যে কিছু উদ্ভট তত্ত্বের আভাস মিলছে।

৪। কলকাতার ঘিঞ্জি জীবনটা ছোঁয়াচে রোগের মত সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে।

৫। এর প্রমাণ গৌরী আমাকে ভালবেসেছিলো। এবং পরে আরেকজনকে সহজেই বিয়ে করেছে। অর্থাৎ নৈতিক দিক

থেকে সে একজন সামাজিক বেশ্যা ছাড়া আর কিছু না।'—

শেষের কথাটা সত্যি প্রমাণ করতে সে এত জোরে উচ্চারণ করলো যে আশেপাশের দু'একজন লোক অবাক হয়ে ফিরে তাকালো। ঠিক একটা চল্লিশে শ্যামল ধর্মতলায় পৌঁছলো।

মাঝ দুপুরের রোদ্দুরে শীতটা এখন পাতলা। তাহলেও ময়দানের ঠাণ্ডা হাওয়া শ্যামলের ঝিম ধরা ভাবটায় একটু সুড়সুড়ি দেয়।

"এই হঠাৎ দুপুরটা আমার বেশ লাগছে বুঝলে কিনা—"

শ্যামল শব্দগুলো আতসবাজীর মত শূন্যে ছুঁড়ে দিলো সহজ ভাবে। কথাটা এত আনায়াসে বলতে পেরে সে প্রথমে একটু অবাক হল। তারপর ভাবলো মতামত জানানোটাই আসল ব্যাপার, এবং সব সময় দুনম্বর মানুষ হাজির থাকবেই এরকম মাথার দিব্যি কেই বা দিয়েছে। হেঁটে হেঁটে শ্যামল ময়দানের পশ্চিম দিকে চলে এলো। এখানে রোদ আর ছায়া বেশ নরম সরম ভঙ্গিতে গায়ে গা দিয়ে। অনেকটা নিষিদ্ধ সীমানার ভাবভঙ্গি। শ্যামলের এখনকার মানসিক গঠনের সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে যায়। তার ডাইনে বাঁয়ে অত বড় সবুজ মাঠ বিছানার মত টান হয়ে আছে। মাঝে মধ্যে ঘন গাছগাছালির জটলা। ওয়েসিস। দু একটা উট টুট দেখা গেলে বেশ হতো এইভেবে শ্যামল ঘাড় ফিরিয়ে এদিক ওদিক চাইলো। আর তখন দূরে মাঠের মধ্যে ছড়ানো ছিটোনা গাছপালার নীচে শীতের রোদ্দুর সরে সরে যাচ্ছে। তিনশো গজ

দূরের একটি ওয়েসিস থেকে একজোড়া ছেলেমেয়ে বক বকম ডাকতে ডাকতে বেরিয়ে এলো। শ্যামল মিষ্টি হাসলো মেয়েটিকে দেখে।

'বেশ আছে ওরা,—

শ্যামল কথা শুরু করলো।

ইতিহাস বা রাজনীতি নিয়ে মেটেই মাথা ঘামাচ্ছে না। হয় একজন আরেকজনের সঙ্গে নকল ঝগড়া করছে। অথবা একসঙ্গে ঘরভাড়া করার পরিকল্পনা নিয়ে টিয়ে! এইসব আর কি। এ ব্যাপারে একটা জব্বর প্রবন্ধ লেখা যায়। নাম হবে 'কোলকাতায় ঘরভাড়া'। অবিশ্যি শুধু হাউসিং প্রবেলেমটাই আসল বিষয় নয়। আড়ালে থাকবে মানুষ-মানুষীর খুঁজে বেড়াবার একটা ঝোঁক। অনেকটা রাসেলের ইন্ কোয়েস্ট অফ্ হ্যাপিনেস্-এর ব্যাপারস্যাপারের মত। এই দশ বছরে কোলকাতায় যা লোক বেড়েছে তাতে বাড়িওয়ালাদের পোয়াবারো ছাড়া আর কিছু হয় নি। এই ঘিঞ্জি জীবন থেকে হাঁফ ছাড়তে হলে আমাকে 'লাইটহাউস' খুঁজে বার করতেই হবে।'

এই জায়গায় মাঠ চারপাশে ছড়ানো। কলকাতার জঘন্য পরিবেশের মধ্যে এটাকে ঠিক ভাবাই যায় না। একেবারে বাচ্চা ছেলের মতো যে কোনো দিকে ছুট দিয়েছে। কেমন দূর দূর ভাবনা আসে। শ্যামল মাথা ঘুরিয়ে ভালো করে চারদিক দেখে নিলো। পূবদিকটা ট্রেচারাস্। খেই হারিয়ে যায় তাকালে

স্কাইস্ক্র্যাপারগুলো গাছপালা টপকে ঘিরে ফেলেছে সীমানা। গ্র্যাণ্ডের মাথার উপর বিরাট গ্যাস বেলুন উড়ছে। শূন্যে তাকিয়ে শ্যামল আকাশের বদলে দেখলো GRAND PUJA SALE 1979…।

'শালা আনওয়াণ্টেড খচ্চর।'

এই রকম খিস্তি বেরিয়ে এলো তার দাঁতের ফাঁক দিয়ে। শব্দগুলো নিজের কানে যেতে একটু চমকেই উঠলো সে। কেননা কাকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো বলা হলো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে কিনা শ্যামলের অন্য কাজ আছে। তাই এ নিয়ে আর মাথা ঘামালো না সে। তাছাড়া পশ্চিমের ময়দান আস্তে আস্তে শূন্যে উঠে গিয়ে আকাশের মুখোমুখি থমকে দাঁড়িয়েছে। ওদিকে একটা সমুদ্র থাকলে বেশ হতো। হঠাৎ দেখলে মনে হয় সীমানার ওপর থেকে ঝাঁপ দিলেই টুপ করে আকাশের মধ্যে। সে যাক। শ্যামলের উদ্দেশ্য অনর্থক সমুদ্রে ঝাঁপ দেয়া না বরং। এ ব্যাপারে এক্ষুণি একটা সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার। এমনিতেই দেরী হয়ে গেছে অনেক। সূর্য কি বলে এখন কেল্লার পেছনে। তাড়াতাড়ি বিকেল ফুরিয়ে যাচ্ছে ময়দান থেকে। শ্যামলের অবিশ্যি এমন কোন জরুরী ব্যাপার নেই যে তাকে ছুটতেই হবে। তাছাড়া এই খোঁজাখুঁজির খেলাটা এখন তাকে বেশ পেয়ে বসেছে। গৌরী বা মালতী নামের মেয়েরা প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্ম ছাড়া আর কিছুই বোঝে না এটা একদিক দিয়ে রক্ষে।

শ্যামল ঘাসের ওপর টান হয়ে শুয়ে পড়লো। একটা চোখ

বেশী আছে, এ রকম একটা অহঙ্কার বেশ কিছুদিন থেকে গড়ে উঠছে তার মধ্যে। এটাকে বোধহয় 'স্ট্রাকচারাল ইগো' বলা যায়। তা বলে জীবমাত্রেই নিরনম্ব বায়ুভূক হওয়া উচিত—এ রকম আজগুবী মতবাদ সে মোটেই মানে না।

'হুঁ হুঁ বাওয়া'—বলে মাথা ঝাঁকাতে গিয়ে তার চোখে পড়লো আকাশ। ঘসা কাঁচের মতো বিরাট একখণ্ড মেঘ দ্রুত শুষে নিচ্ছে নীল রং। সঙ্গে সঙ্গে গুমোট ভাব ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। এদিকে হাওয়া নেই বলে উঁচু গাছগুলোও চুপচাপ থমকে, একটা লম্বা লেজওয়ালা পাখি অনেক উঁচু দিয়ে উড়ে যেতে গিয়ে পালক খসে পড়লো মাটিতে। শ্যামল মুচকি হেসে টা-টা করে দিলো তাকে। কে জানে ওটাও লাইটহাউসের খোঁজে চলেছে কিনা। এইখানে এসে শ্যামলের মনে পড়লো তাকে লাইটহাউস খুঁজতে হবে। তার পিঠের নীচ দিয়ে যুদ্ধযাত্রায় চলেছে পিঁপড়ের দল। কাত হয়ে মাটির উপর ঝুঁকে পড়লো সে। দেখলো তার চার পাশে ভিড় করে আছে অশ্বত্থের ছায়া, টুকরো কাগজ, খড়কুটো, পিঁপড়ের ডিম, বাদামের খোসা, আর ঝরা পালক। ওর মধ্যে বেছে বেছে শ্যামল পালকটাকেই তুলে নিলো। দু' রকম রঙ মিলে মিশে গেছে। কিছুটা মেঘ আর কিছু আকাশ। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ভালো করে দেখা হলে মাটির ওপর আবার সটান। এইবার চোখ বুজে নাকে-মুখে হালকা সুড়সুড়ি দিতে লাগল সে।

বাঃ বেশ লাগছে তো —এ রকম মুখের ভাব তার।

মনে হচ্ছে নরম মেঘের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছি আমি অ্যালবাট্রস্। আমার পায়ের নীচে সমুদ্র ভাঙছে বারে বারে। ঢেউ ওটার শব্দ। আর হাওয়া, হাওয়ার গর্জন। এইবার একটা লাইটহাউস পাওয়া গেলেই কেল্লা ফতে। তড়াক করে উঠে বসলো শ্যামল। একটা প্ল্যান এসেছে মাথায়। পালকের ডাঁটিটাকে উল্টে নিয়ে কলমের মতো ব্যবহার করলো সে। 'ধরা যাক ২০০ ফুট লম্বা এটা।'

মাটির ওপর দাগ টেনে মাথা ঝাঁকালো শ্যামল।

'আর একদম মাথার উপরে থাকবে এই রকম গম্বুজ ঘর। চারদিকে কাঁচের দেয়াল ঘেরা। কিন্তু হাওয়া খেলবে খুব। আর হ্যাঁ—কংক্রীটের ফ্রেম হবে পুরোটার। দুদিকে দুটো বিরাট সার্চলাইট। ১৮০ ডিগ্রী অ্যাঙ্গেলে ঘুরে ঘুরে আলো ছিটিয়ে দেবে সমুদ্রে। এর সঙ্গে একটা অ্যালার্মিং সাইরেন থাকলে আবহ সংগীতটা মন্দ হয় না।'

মাটির উপর ছবি আঁকতে আঁকতে শ্যামল বেশ উত্তেজিত। তার নাকের ফুটো এখন বেলুন। চুল সজারুর কাঁটা। চোখ দুটো হাইসেলের টর্চ। গা শুশুকের মত ভেজা পিছল। এদিকে অনেক কিছু ঘটেছে তখন। আকাশ ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেছে বলে লোকজনও চলে যাচ্ছে মাঠ ছেড়ে। খুব তাড়াতাড়ি খালি হয়ে যাচ্ছে বিরাট ময়দান। দু একজোড়া চলতে গিয়ে অবাক চোখে তাকিয়ে গেল তার দিকে। শ্যামল পাত্তাই দিলো না ওসব ছেঁদো ব্যাপার। এখন শুধু মাথা উঁচু গাছগুলো

চুপচাপ দেখছে তাকে। এই কীর্তির ভাগ সে কাউকেই দিতে চায় না আগে থেকে। শ্যামল বেশ কিছুটা পেছিয়ে গেল। ঠিক দশ বারো ফুট সামনে মাটির উপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছে তার আশ্চর্য সৃষ্টি। যার গায়ে মেঘ আর আকাশের ছোঁয়া। শ্যামল হামাগুঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে এগোতে লাগলো সেদিকে। এখন তাকে যে কেউ দেখলে গভীর সমুদ্রে শুশুকের কথাই মনে পড়বে। শুশুকের ডানায় ঠিক এ রকম ছন্দ থাকে। আর ঠিক তখন দারুণ হাওয়া উঠলো মাঠের মাঝখান থেকে। কেল্লার পেছন থেকে হৈ-হৈ করে ছুটে এলো আর একটা দমকা হাওয়া। ময়দানের ছড়ানো ছিটোনো গাছগুলো আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠে হুম-হাম শব্দ করতে থাকলো। খুব তাড়াতাড়ি মাঠ পারাপার করলো ধুলোর ঝড়। শুশুকের ডানাও তড়বড়িয়ে উঠলো সেই ধাক্কায়। তখন ঢেউয়ের মতো পাক খেতে লাগলো ধুলো। আর ঘুরপাক খেতে খেতে সেই দারুণ ঝড় বিরাট থামের মতো ঠেলে উঠতে থাকলো শূন্যে ঠিক যেখানে মাটির উপর শুয়ে আছে অদ্ভুত আবিষ্কার। তার চোখের সামনে ঘুর্ণি ঝড়ের মধ্যে মাটির উপর আস্তে আস্তে দাঁড়িয়ে উঠলো আলোর মুকুট পরা ২০০ ফুট উঁচু এক আশ্চর্য লাইটহাউস। খড়কুটো ছেঁড়া কাগজ পালক আর বাদামের সঙ্গে শ্যামল ঝড়ের মতো উড়ে গেল সেদিকে। যেদিকে নীচের রাস্তা।

মঞ্চের কথা।

মানে আড়াই ফুট উঁচু পঁচিশ ফুট লম্বা কুড়ি ফুট চওড়া একটা প্লাটফর্ম। যার দুপাশে তিনটে করে ছ'টা আর পেছনে দেয়াল জোড়া পর্দা। উইংসের রঙ আকাশী আর ব্যাক স্ক্রীনের রঙ গাঢ় নীল। কিন্তু সামনের পর্দায় খয়েরী রঙের উপর সোনালী লতাপাতার জটলা শো আরম্ভ হওয়ার আগেই অবশ্য সামনে থেকে পর্দা সরে গেছে। কিন্তু ঘন অন্ধকারে তা দেখা যায় নি। আপনি মঞ্চে ঢোকার পর প্রুসেনিয়ামের দুদিকে দুটো স্পট জ্বলেছে। শুধু আপনি ছাড়া আলোর মধ্যে আর কিছু নেই। আর ব্যাক স্ক্রীনের উপর আপনার দ্বিগুণ বড় ছায়া। এখন আপনার পরণে দারুণ সাদা চোস্ত্। গায়ে সবুজের উপর হলুদ বুটিদার সিল্কের বেনিয়ান। কাঁধ থেকে মাটিতে লুটিয়ে আছে মেরুন আঙরাখা। মাথার উষ্ণীষে দাউদাউ হীরে জ্বলছে। কিন্তু এ আপনার আসল পোশাক না। আসল পোশাক অন্য কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন হ্যাঁ, মঞ্চের উপর আপনার আলাদা ভূমিকা। আপনার নড়াচড়া, গলার আওয়াজ, যে কোন অঙ্গভঙ্গি বা, মেপে পা ফেলা এখন আমাদের শাসন করছে। এর নাম সম্মোহম কিনা আমি জানি

না। তবে বুঝতে পারছি নিজের উপর আমার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। আমি এখন সহজেই আপনার দখলে। খুব তাড়াতাড়ি ভুলে যাচ্ছি আমার চারপাশ এই সব। এটা বোধহয় শেষ খেলা। নাম অপটিক্যাল ইলিউশান নাম্বার ফাইভ।

কেরাণীর কথা।

আমি একজন কেরাণী। সাড়ে পাঁচফুটের বেশী লম্বা না। চোখের চশমা এবং মাথার চুল খুব ছোট করে ছাঁটা। আমার চলাফেরা একটু মেয়েলী ধাঁচের। কথাবার্তা বেশীর ভাগই ডি এ. বাড়া কমা বা সংসার খরচ বা মাথার চুলে খুসকি সংক্রান্ত। কিন্তু খুব নিরীহ। নিরীহ মানে যে আসলে হিংসুটে হলেও বাইরে খুবই ঠাণ্ডা স্বাভাবের। এবং ভীতু। রাগী লোকেরা অল্পেই উত্তেজিত হয়ে দাঙ্গা বাঁধিয়ে দেয়, খিস্তি টিস্তি করে। আমি নিরীহ বলে কারো সাতে পাঁচে থাকি না। গোলমাল দেখলেই বাসে উঠে টুক করে কেটে পড়ি। অফিসে ইউনিয়ানের মিছিল টিচিল থাকলেই আমার আমাশা হয়। অথবা ছোট মেয়ের সর্দি জ্বর। তাই বলে দশ টাকা ডি, এ, বাড়লে আমার আপত্তি করার কিছু থাকে না। ওটা আমার হক্কের পাওনা কিনা। নিরীহের মধ্যে হরিণ আর কেরানী একনম্বর। কেরানীকে কেন হরিণনয়না বলে না আমি বুঝি না। অফিসে বড়বাবুর ধমক, বাড়িতে গিন্নীর মুখঝামটা, রাস্তায় পাওনাদারের খিস্তি আমার অস্থির চোখে সব সময় ছটফট করে। এমন কি নিজের ছায়া দেখেও মাঝে মাঝে মাঝে চমকে উঠি। তো একদিন আয়নায় ভালো করে দেখে

নিয়েছি। নিরীহ চোখ আর কাকে বলে! তবু যে কেন! সে যাক।

এখন শিক্ষক।

আর এক ধরনের নিরীহের মধ্যে তাঁকে ফেলা যায়। তিনি একজন শিক্ষক। মাঝে মধ্যে খবরের কাগজে ফিচার লেখেন বলে একটু অহংকারী। শিক্ষকেরাও সাধারণত সাড়ে পাঁচ ফুটের মতো লম্বা হয়। নাকের ফুটোয় অথবা কানের উপর তু তিন গাছা চুল। গায়ের রঙ শ্যামলা অথবা ফর্সা। পরণে কারো ধুতি পাঞ্জাবী কারো ধুতি শার্ট কারোর প্যাণ্ট-শার্ট। মাথার চুল একটু বেশী বড়, স্বভাবে শান্ত শিষ্ট। মাঝে মাঝে ছাত্র ঠ্যাঙালেও মা ও বউয়ের এঁরা খুব বাধ্য হন। ব্যাচেলর শিক্ষক বড়জোর তু'একদিন মদটদ খান। এছাড়া সমাজের নৈতিক কাঠামো সম্পর্কে তিনি কেরাণীর মতোই রক্ষণশীল। তাঁর কথাবার্তার ধরন অবশ্য আমার সঙ্গে কিছু মেলে, আবার কিছু আলাদা। যেমন ইউ, জি, সি স্কেল বদলানো দরকার অথবা এই দারুণ খারাপ সময়ে আমাদের মধ্যে বিভেদ থাকা উচিত নয়। এগুলো অমিল। শিক্ষকের নানান সমস্যায় তিনি সব সময় অসন্তুষ্ট। কিন্তু আন্দোলনের সময় তিনি খুব যত্ন করে ভিড় বাঁচিয়ে চলেন। কেরানীর সঙ্গে এখানে বেশ মিল থাকলেও এসময় তাঁর ব্যক্তিত্বের উপর একটা নকল গাম্ভীর্য হালকা ভাবে মাখানো থাকে। ভাবখানা এই, বুদ্ধিজীবীরা একটু ঠাণ্ডা স্বভাবের হবে তা তুমি যাই ভাবো। এই রকম

ডবল ব্যক্তিত্বের জন্য কেরানীর তুলনায় তিনি দুনম্বরী নিরীহ। নিরীহের আরো শ্রেণীভেদ করতে পারি। কিন্তু একটু মুখ বদলালে ভালো হয়। মানে একটি তেজী ঘোড়া আমার আর একদিকে আছে কিনা। অবশ্য ওই একজনের জন্যেই আর কি এভাবে সারি সাজানো। তো···

এবার ছাত্রযুবকের কথা।

কিন্তু নিরীহের মধ্যে এখন সবাইকে ফেলা যাচ্ছে না। সে একজন ছাত্র। আর বেশীর ভাগের মতোই এক্সোট্রোভার্ট হুল্লোড়বাজ। ছাত্ররা সাধারণত সাড়ে পাঁচ থেকে পৌনে ছ'ফুটের মতো লম্বা হয়। তাদের বেশীর ভাগের পরণে ফ্লেয়ার্স আর টীশার্ট। চওড়া বেল্ট কোমরে। মাথায় কানঢাকা লম্বা চুল। অমিতাভ চুলের গব্বর সিং বুকনি। তাকে মিলিয়ে নিতে গেলে এই রকমই লাগবে। কলেজ ইউনিয়নের সীট আর আঠারো বছরের মেয়ের দখল নিয়ে সে সমানভাবে মারপিট করতে পারে। তাবলে দু'চারজন শান্ত নিরীহ স্বভাবের থাকে না তা না। ভুললে চলবে না কেরানী অথবা শিক্ষক এদের মধ্যে থেকেই তৈরী হয়। সে যাক। তার কথাতেই আসি। সে নিজে শিক্ষক বা কেরাণী হবে কিনা এখনো কিন্তু জানে না। তবে হ্যাঁ প্রেম করে বলে খুবই গর্বিত। প্রেমিকা সঙ্গে থাকলে অহংকারের মতো মুখ করে হেঁটে যায়। তখন সে ছ'পকেটঅলা জিনের প্যান্ট পরে, আর গায়ে থাকে কলারতোলা চক্রবক্রা গেঞ্জী। কেরাণী অথবা শিক্ষকের সঙ্গে তার কথাবার্তায় কোনো মিল নেই। সে চেঁচিয়ে

কথা বলে। আর বিষয় প্রায় সব সময়েই ফিল্‌মিকেচ্ছা সংক্রান্ত। অবশ্য মাঝে মধ্যে টেষ্ট ক্রিকেটের কথা এসে পড়েই। তখন প্রায়ই ঝগড়া দিয়ে আলাপ শেষ হয়।

আবার মঞ্চ।

মানে তিনি আমি আর ছাত্রযুবক এইরকম তিনজন এক সারিতে পাশাপাশি বসে আপনার মুখের দিকে ঠায় চেয়ে আছি। মঞ্চের উপর আপনি মুচকি হাসছেন গোঁফের ফাঁকে। কিন্তু গম্ভীর স্বর গলার আওয়াজে। হলঘরের হাওয়ায় ভেসে যায় টুকরো টুকরো কথা। মনে হয় হুকুম করার জন্যই আপনি ওখানে দাঁড়িয়েছেন আড়াল থেকে বাজনা বাজছে! গোলাপী আলোর মধ্যে এখন আপনার হাত নেই পা নেই বুক-পেট কোমর কিছু নেই। শুধু শূন্যের মধ্যে এক ফ্যাকাশে রঙের কাটা মুণ্ডু পিট পিট করে তাকাচ্ছে এদিক ওদিক। ক্ল্যারিওনেটের সুরের সঙ্গে ভঙ্গিতে সে মুখ হাঁ করছে এবং বন্ধ করছে। মুখ থেকে শূন্যে ছিটকে যাচ্ছে ছোট্ট ছোট্ট আগুনের ফুল। অন্য দর্শকদের অবস্থা আমার মতো নাকি? কে জানে। কিন্তু এদিকে দেখছি আমার চোখের উপর আপনি পুরোপুরি মিলিয়ে গেলেন। আর আলোর বৃত্তের মধ্যে ভেসে উঠলো এক ভয়ঙ্কর খড়্‌গনাক গণ্ডার। ভয়ে আঁৎকে উঠলাম আমি। আঁৎকে উঠে এদিকে ওদিক চাইলাম। কিন্তু একি আমার দুপাশে ও তখন সেই মায়ার খেলা শুরু হয়ে গেছে। আমি ভয়ের মতো মুখ করে দেখলাম সামনের সারি সারি মানুষ একে অন্যের হাত চেপে ধরতেই পলকে গণ্ডার হয়ে

পাল্টে যাচ্ছে। আমার ডানদিকে তিনি বসেছেন। কেমন আছেন এই ভেবে আমি খুব তাড়াতাড়ি সেদিকেই ফিরতেই এক বিকট চেহারার গণ্ডার ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করে উঠলো। ঝটকা মেরে মাথা ঘুরিয়ে বাঁ পাশে চাইলাম। আর সেখানে সেই ভীষণ খেলার মাতামাতি। আমার ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে অবিরাম গণ্ডারের ঢেউ বয়ে চলেছে। কি ভয়ঙ্কর! আমি মরিয়া হয়ে বার বার এদিক ওদিক তাকালাম অন্তত এক-জনকে যদি আমার সঙ্গী পাই। আমাকে হয় এই ভয়ের খেলায় জিততে হবে। আর নইলে আমিও, মানে। চট করে বাঁ দিকে চেয়ে আর এক গণ্ডারের বিদখুটে চেহারা দেখে নিলাম। কিন্তু সে বা তিনি কারোরই পাত্তা পাওয়া গেলো না। ভয়ের সঙ্গে একরকমের ঘেন্না ঘেন্না ভাব আমার গায়ের মধ্যে গুলিয়ে উঠেছে এখন। আমি চোখ বুজে মন স্থির করার চেষ্টা করলাম। এই যে তিনজন পাশাপাশি। আমরা নির্ভেজাল মানুষের পরিচয়েই আছি। হিংসুটে বা রাগী মানুষের মধ্যে যা আমাদের মধ্যেও তাই। মানে দুশো বারো খানা হাড় নানা কায়দায় সাজানো গোছানো। এই যে কাঠামোটা তৈরী হলো, তার ফাঁকে-ফোঁকরে আরো কিছু নরম সরম কিন্তু গোলমেলে যন্ত্রপাতি গুঁজে দেখা আছে। আর সেগুলো ইলেক্ট্রনিক্সের খুব গুণসম্পন্ন বলা যায় অনায়াসে। কিন্তু তাতেই বা হলো কি! এতো করেও দু এক ফোঁটা সূক্ষ্ম চেতনা ঢালতে না পারলে মাটির ডেলা ছেড়া আর কিছুই দাঁড়ায় না। এই পর্যন্ত ভাবার পর আমি বুঝলাম আমার কিছুতেই ভয়

পাওয়া উচিত না। এবং এ সবই আপনার জাদুর কারসাজি। কিন্তু ততক্ষণে হাওয়া পাল্টে গেছে একেবারে। হলঘরের মধ্যে অন্ধকার ঘন হয়েছে আরো। কোত্থেকে গরম গরম হাওয়া বইছে দমকা। গায়ের উপর ফোঁস ফোঁস শ্বাস পড়ছে কার, কাদের। আর সেই সঙ্গে উদ্দাম অর্কেস্ট্রার তালে তালে নশো নিরানব্বুইটি গণ্ডারের বিকট নাচ। খড়গে খড়গে ধাক্কা লেগে খটাখট শব্দ উঠছে অন্ধকারে। আমি চিৎকার করে আপনার উদ্দেশ্যে বলতে গেলাম—হ্যাঁ মশাই, আমাকে শুধু শুধু ভয় দেখাচ্ছেন কেন? তার বদলে গলার মধ্যে আওয়াজ হলো ঘোঁৎ।

পশ্চিম আকাশে সোনালী বলের দিকে টার্গেট করে দুবার গুলি ছুঁড়লেন। এটা অবিশ্যি কাউকে মারার জন্যে না। চারপাশে ভিড় করে এসেছিলো কয়েকটা সরুমুখ শেয়াল। একটার নাকের উপর লালরঙের দাগ আছে। এক্ষুণি কোনো মরা পশুর শরীর হাটকে এসেছে বোধহয়। চোখের মধ্যে খুশির ভাব। জিভ বার করে মুখ চাটছিলো বারবার। তিনি জানেন এরা খুব চালাক হয়। মাথার মধ্যে সবসময় প্যাঁচ খেলে। চালাক না বলে শেয়ালের আগে কানিং শব্দটা বসালে মানানসই হতো। এখনো নিশ্চয়ই কোনো মতলব নিয়ে এগিয়ে আসছিলো। জঙ্গলের কোন দিকে ওদের আস্তানা জানেন তিনি। ইচ্ছে করলে ওদের সীমানার বাইরে চলে যেতে পারতেন। কিন্তু এই নিস্তব্ধ বন, ওই উঁচু দেওদার দলবেঁধে চুপচাপ দাঁড়িয়ে, টুসক ঘাসের মাঠের শেষে এঁকে বেঁকে চলে যাওয়া ছোট নদীখাত, এ সবই তাঁকে আটকে ফেলেছিলো অদৃশ্য সুতো দিয়ে। চশমার মধ্যে তিনি অবাক চোখে ম্যাজিক দেখছিলেন। সোনালী বল থেকে ঠিকরে আসছিলো হলুদ রং। শুধু পাখিরা গান গেয়ে ঘরে ফিরছিলো। তাদের পাতলা ডানা থেকে হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে সোনালী পাউডার। আর খাদের

জলে চাপা কিন্তু স্পষ্ট কুলকুল আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন তিনি। এই আশ্চর্য সময়ের মধ্যে শেয়ালের দলকে মানায় না। তিনি চাইছিলেন যেভাবে হোক ওরা চলে যাক কিছুক্ষণ্যের জন্য। আর তাই আকাশে তাক করে দুবার গুলি ছুঁড়লেন।

কিন্তু গুলির শব্দে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল নিস্তব্ধ বন। পাখিরা ভয় পেয়ে এলোমেলো ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো, গভীর জঙ্গল থেকে ভেসে এলো হায়েনার হাসি, কলোবাস বানরের চিৎকার, বনমানুষের বুক চাপড়ানোর আওয়াজ, বাঘের ডাক। এই ছন্দপতন চাইছিলেন না তিনি। প্রকৃতির নিজের তৈরী এই চিড়িয়াখানায় একটু পরে ঢুকবেন এরকম মতলব ছিলো। নিজের ভুলেই এটা ঘটলো বুঝলেন। কিন্তু এখন আর শুধরে নেয়ার উপায় নেই। কি করে পিছু হাঁটবেন তিনি। গভীর রাতের আগেই তিনি জঙ্গলকে জাগিয়ে দিয়েছেন। এখন নিজের নিয়মে রাজত্ব শুরু করবে জঙ্গলের প্রাণ। অস্থির হবে, ছটফট করবে চারপাশে, দামাল হয়ে উঠবে, কখনো ফিস ফিস শব্দের ঢেউ অন্ধকারে বয়ে যাবে। মানিয়ে নেওয়ার আগে একটু সময় দরকার এই ভেবে বাঁ হাতে চশমাটা খুলে ফেললেন তিনি।

পশ্চিমের গেট থেকে একটি লোক এগিয়ে আসছে। কারা যেন কথা বলছে পাশে। একহাতে উনুন আর একহাতে কেটলি ঝুলিয়ে সরাসরি সামনে এসে দাঁড়ালো সে।

চা দেবো স্যার ?

মুখের দিকে তাকালেন তিনি। বছর পঁয়তিরিশ বয়স হবে তার, বুড়োটে মেরে গেছে কিরকম। ময়লা ধুতি হাঁটুর উপর তুলে পরা, খাঁকি হাফশার্ট পায়ে জুতো নেই। দাড়িতে পাক ধরেছে এর মধ্যেই। একটু ঝুঁকে বিনীত তাকিয়ে আছে লোকটি। ভাবলেন মাথাটা খেলিয়ে নিলে মন্দ হয় না। ইশারা পেয়ে চা ঢেলে দিলো সে। বাঁ হাতে পয়সা দিয়ে ডান হাতে ভাঁড়ে চুমুক দিলেন তিনি। চা-ওলা সরে গেলো। এখন বেশ অন্ধকার নেমে গেছে চারদিকে। তিনি যে বেঞ্চে বসে আছেন তার মুখোমুখি ছড়ানো মাঠ সবুজ ঘাসে ভরে আছে। খুব যত্ন করে ছাঁটা অবিশ্যি। মাঝে মাঝে মাঝে ঝাউগাছের গোল ছাতা। মাঠের ঠিক মাঝখানে একটি সুন্দর সিমেণ্ট বাঁধানো ফোয়ারা। এখন অবিশ্যি জল নেই, শুকনো খটখটে। কিন্তু রং-বেরং ফুলের টব বসানো আছে কার্নিস ঘিরে। কি ফুল ওগুলো ?

বোগেনভেলিয়া, কলাফুল বা হটজীঞ্জার ? যাই হোক দেখতে ভালোই লাগছে কিন্তু। সারা মাঠ ঘিরে আছে পীচ বাঁধানো রাস্তা। যার দুপাশে ১০ ফুট অন্তর শিশু আর অর্জুন গাছের দল। তার বেঞ্চির পিছনে বেশ পাক খেয়ে গেছে ওই পথ। তারপরে আবার মাঠ। বাগান তৈরীর পিছনে বেশ পরিকল্পনা আছে। কে জানে স্বর্গের বাগান বোধ হয় এরকমই। একটু হাসলেন তিনি। এতক্ষণে

আলো জ্বলেছে বাগানে। লোহার পোস্টগুলো একশো হাত দূরে দূরে দাঁড়িয়ে। তাতে পথের উপর আবছা আলোর আস্তরণ শুধু, এর বেশী কিছু না। কিন্তু পার্কের মধ্যে ঘাসের উপর একরাশ উজ্জ্বল অন্ধকার। অমাবস্যার রাত্রে তারার আলোতে যেমন দেখায়। এখন সিগারেট ধরালেন তিনি। ধোঁযার সঙ্গে একটা আঃ শব্দ বেরিয়ে এল তার মুখ দিয়ে। তৃপ্তির ভাব ছড়িয়ে পড়লো শরীরে। হাত পা টান করে আড়মোড়া ভাঙলেন একবার। আশেপাশে দুয়েকজন ফিরে তাকালো তাঁর দিকে। ওরা কেন এসেছে জানেন না তিনি। কয়েকজন নিশ্চয়ই হাওয়া খেতে। তাঁর মুখোমুখি ১০ ফার্লং দূরে ঝাউগাছের নীচে একজোড়া ছেলেমেয়ে বসে আছে। ঝোপটা বেশ বড় বলে বাঁদিকে আড়াল নিয়ে বসেছে ওরা। তবু তিনি লক্ষ্য করেছেন অন্ধকার বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরা ঘন হয়ে আসছে। বাগানের দেয়াল সামনে এগিয়ে নব্বই ডিগ্রী পাক খেয়ে পশ্চিমের গেটে শেষ হয়েছে। বাইরে চওড়া রাস্তা। এখন সন্ধ্যেরাতে গাড়ির ভিড় একটু একটু বেশি। লোকজন ভেলপুরী, ফুচকাওলা। রাস্তা পেরোলে গঙ্গা। এখন হাওয়া খাওয়া মানুষের ভিড় বাড়ছে। কুড়ি ফুট নীচে পাক খেয়ে উঠছে ঘোলা জল। ফুরফুরে হাওয়া বইছে জল ছুঁয়ে। আরামে চোখ বুজে আসছে তাঁর। একবার গঙ্গার দিকে তাকালেন তিনি। কয়েকটি গাড়ি আর এলোমেলো মানুষ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না। তবে মাথা

ঘামালেন না এ নিয়ে। ওখান থেকে অনেক দূরে বসে আছেন তিনি। অন্তত আড়াইশো গজ হবে। কিন্তু চোখ বুঁজে বলে দিতে পারেন দু তিনটি খেয়ানৌকো এখন মাঝনদীতে অলস ভেসে আছে। ছইয়ের মাথায় দোল খাচ্ছে এক চিলতে লণ্ঠনের আলো। এছাড়া ভুসোকালির মত অন্ধকার মাখা ছইয়ের মাথায়, গলুইয়ে। নদীর ওপারের আকাশে আলোর ফুটকি। ঠাকুরঘরে কেউ কি প্রদীপ জ্বেলেছে এখন? কেউ গলায় আঁচল দিয়ে শাঁখে ফুঁ দিচ্ছে কি? মন্দিরের আরতি শুরু হলো? কিন্তু শাঁখের আওয়াজের বদলে গঙ্গার বুকে বেজে উঠলো লঞ্চের ভোঁ-ও-ও-ও-ও। বাইরের ঘরে বোধহয় ধরসাহেব জাঁকিয়ে বসেছেন এতক্ষণে। সামনে ওল্ড্ মঙ্কের পেগ আর কাজু নাট্স। হালকা সিপের সঙ্গে মুনমুনের গায়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে চোখ। সে নেই বলে ধর সাহেব চটে যাবেন কি? না না, তা কি করে হয়। বুড়ো শিয়ালের চোখের চাউনি তিনি ভালো করেই চেনেন। বড় জোর চোখ টিপে মকারি করবেন একটু 'আ হেল হি ক্যাড্ হ্যাভ বীন্ অ্যাট লীস্ট্,' ব্যস। একটা চকচকে কাগজ হাত বদল করবে তক্ষুণি। মুনমুন ঘাড় বেঁকিয়ে কপট হাসবে শুধু। কবরীতে আজ চুল বেঁধে এসেছে মুনমুন। বোধহয় বট্‌ল্‌গ্রীন বেনারসীটা পরবে। তুলি আঁকা ভুরুর মাঝখানে এতক্ষণে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। তা যদি হয়, তাহলে গলায় নিশ্চয়ই থাকবে সেই বিখ্যাত সরু চেন যার লকেটের বদলে

দুটো বাঘের দাঁত আলগা ছুঁয়ে থাকে মুনমুনের বুক। এসব ব্যাপারে মুনমুনের ভুল হয় না। কাল সকালে তাহলে কি সুদিন হবে তাঁর ? দেখা যাক। একটু আনমনা হতে চাইলেন তিনি। তখন একটা ফিস ফিস শব্দের ঢেউ পেছনের রাস্তায় বয়ে গেলো।

সুইট, সিক্স্‌টিন স্যার, পুয়োর স্টুডেণ্ট স্যার···

তিনি একটু হাসলেন। কবে যেন খাবার মজুত থাকতো সকলের ঘরে। গোলাবাড়িতে ধান, পুকুরভরা মাছ, ঢাকের কাঠিতে গুরুগুরু আওয়াজ, শিউলি ছড়িয়ে পড়তো ভেজা মাটিতে। একবার মাংসের খদ্দেরকে দেখে নেবেন নাকি ? থাক। খদ্দের আর ব্যাপারীর সমস্যা নতুন কিছু না। স্বর্গের বাগানে স্বর্গসুখ—এরকম একটা তুলনা মাথায় এলো তাঁর। ঠিক তখন চক্রাবক্রা পোশাক পরা তিনটি কমবয়সী ছোকরা সামনের ঝাউগাছ লক্ষ্য করে এগিয়ে গেলো। নজর সরু করলেন তিনি। কান খাড়া। ওখানে একজোড়া ছেলেমেয়ে বসে আছে বিকেল থেকে। পাহারাওলা সময় বুঝে সরে গেছে। এখন মাশুল দিতেই হবে ওদের। কি আর করা যাবে। রুমালে ঘসে নিয়ে চশমা পরলেন তিনি।

এখন গভীর জঙ্গলের মাচায় বসে আছেন তিনি। চারদিকে থমথমে রাত ছড়িয়ে আছে। মাচাটা তৈরী হয়েছে উঁচু গাছের ডালে। মাটিতে বাঁধা আছে জ্যান্ত টোপ। প্রাণের ভয়ে কুঁকড়ে গেছে বেচারা। করুণ চাপা গোঙানি

থেমে থেমে গুমরে উঠছে অন্ধকারে। ৮০ গজ দূরে হুদ্দাড় শব্দে ছুটে গেলো একটা শম্বর। অল্প হাওয়া ছেড়েছে এখন। গাছের পাতার মধ্যে সরসর শব্দ হচ্ছে একটানা। ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক। হাওয়ায় কড়া গন্ধ ছড়াচ্ছে কোনো অচেনা ফুল। অনেক দূরে ফেউ ডেকে উঠলো একবার। এছাড়া আর কোনো আওয়াজ নেই। নজর তীক্ষ্ণ করে মনঃসংযোগ করেছেন তিনি। ফোর ফিফ্‌টি-ফোর হাণ্ড্রেড ডবল ব্যারেল রাইফেল সেফ্‌টি ক্যাচ খুলে হাতের মধ্যে। চোখের মণি বলবেয়ারিং-এর মত ঘুরে যাচ্ছে ঝোপের আনাচে কানাচে আলো আঁধারিতে। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ ভালো করে ওঠেনি এখনো। তবু আভাস জেগেছে জঙ্গলের মাথায়। ডালপালার মধ্যে দু এক টুকরো আলোর জাফরী কাটা নক্সা। তিনি কোনো শব্দ না করে পিছনে চাইলেন। অনেকখানি ছড়ানো মাঠ ওদিকে ঘাসে ভরে আছে। তার ওপারে আবার জঙ্গল। এক মানুষ সমান লম্বা এলিফ্যাণ্ট্ ঘাস, সুঁচোলো আগায় ক্ষুরের মত ধার। এখন ফুরফুরে হাওয়ায় ঢেউ খেলে যাচ্ছে ঘাসবনে। ওখানে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই, কোথাও বেশী ফুলে উঠছে না ঘাসের জঙ্গল, কোনো খস খস আওয়াজ না। শুধু অনেক দূরের জঙ্গল থেকে একপাল হিংস্র কুকুরের ডাক ভেসে এলো। এ ছাড়া সব চুপচাপ এখানে। পাকা শিকারীর মত একটুও উতলা না হয়ে সামনে ঘুরে বসলেন আবার। একেই বোধহয় 'শবরীর প্রতীক্ষা' বলে। সবাই

যখন ঘুমের মধ্যে তলিয়ে তখনই শাস্ত তপস্যার সময়। এই অস্ফুট চাঁদ, বুনো ফুলের গন্ধ, আর হালকা হাওয়ার পথ দিয়ে চুপি চুপি এগিয়ে আসে সিদ্ধি। দূরের আকাশে এখন কত নতুন তারা জ্বলে উঠেছে বা নিবে যাচ্ছে একা একা। তিনি শুধু জানেন বাঁচা খুব দামী জিনিস। আর তার জন্যে চাই নিখুঁত পরিকল্পনা আর হাতের টিপ। এখন এই মুহূর্তে তার চোখ যেমন একজোড়া আগুনের গোলার দিকে আটকে আছে। গোলা দুটো সামনের ঝোপের মধ্যে থেকে এগিয়ে আসছে একটু একটু। বিচ্ছিরি পচা গন্ধ মাটি থেকে ঠেলে উঠছে জঙ্গলের হাওয়ায়। হঠাৎ অন্ধকার বেড়ে গেছে চারদিকে। ফুল-লতাপাতাও বোধহয় ভয় পেয়েছে এবার। তিনি কিন্তু উত্তেজিত হন নি একটুও, মুখের একটা পেশীও কাঁপলো না তাঁর। চোয়াল নড়লো না। শুধু কঠিন শপথ ফুটে উঠলো চোখের মধ্যে। শান্ত মুখে তিনি চুপচাপ ট্রিগারে আঙুল রাখলেন।

এখন শেষ রাতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। জ্যান্ত টোপ বাঁ হাতে বুকের কাছে ঘুমিয়ে পড়েছে। মরা চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে জঙ্গল-মাঠ-নদী। এলিফ্যাণ্ট ঘাসের জমিতে ঢেউয়ের কাঁপন লেগেছে আবার। বুনোলতা খুশিতে মেতেছে। বনটিয়ার ঝাঁক বোধহয় বুঝতে পেরেছে রাত শেষ হোলো। কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে ডান হাতে চশমা নামালেন চোখ থেকে।

এবার যেতে হবে, এই ভেবে বেঞ্চি থেকে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। ফাঁকা হয়ে গেছে চারপাশ। ঝাউগাছের আড়ালে আর কোনো আলাদা ছায়া নেই এখন। মাংস বিক্রীও শেষ হয়ে গেছে। অল্প কুয়াশা নামছে আকাশ থেকে। তারার আগুন এখন আরো স্পষ্ট। এক্ষুণি রাতের অন্ধকারে টুপ করে ডুবে যাবে স্বর্গের বাগান। নদীর বুক এখন ঝাপসা দেখাচ্ছে আগের চেয়ে। ডিঙিনৌকো ঘাটে বাঁধা। পাটাতন থেকে উনুনের ধোঁয়া শূন্যে পাক খেয়ে কুয়াশায় মিশে যাচ্ছে। ছলাৎ শব্দ উঠছে জলে। বোধহয় জোয়ার এলো। জলের উপর ঝুঁকে পড়া বেঁটে অশ্বত্থের ডালে পাখির সংসারে কিচ মিচ ডাক উঠছে। এসব দেখতে দেখতে তাঁর মুনমুনের কথা মনে পড়লো। তিনি ভাবলেন, কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে আমার মুখ কি শেয়ালের মত দেখাবে ?

ক্যাপ্টেন মার্কোস বলছি

এক্ষুণি আমার মাথার মধ্যে একটা জাহাজের ছবি ভাসছে। ছবিটা সম্পূর্ণ না। টুকরো টুকরো আলাদা। বলা যেতে পারে এক একটা অংশ এক একবার দেখা দিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। এই যেমন গোটা চারেক মাস্তুল এলো চোখের সামনে। ভালো করে দেখার আগেই পেল্লায় লম্বা চওড়া কাপড়ের টুকরো ওগুলো ঢেকে দিলো। এইরকম কত কি দেখছি। কাঠের টুকরো, দড়িদড়ার কুণ্ডলী, বাক্সের স্তূপ, পাল গোটানো মাস্তুল, ডেকের একখণ্ড সরু মুখ, কোথাও খুব মোটা কাছির জটলা। একবার দেখলাম দুটো হাত খুব জোরে জোরে একটা লোহার চাকা ঘুরোচ্ছে। আবার দেখলাম আশিটা দাঁড় একসঙ্গে জলে ঝাঁপ দিলো। এইরকম সব। একটা জিনিস বুঝে গেছি, জাহাজটা খুব পুরোনো দিনের। এখনকার জাহাজে পালটাল দড়িদড়া সব বাতিল। ওটা একশো বছর আগের হতে পারে। তাছাড়া মধ্যযুগের হলেই বা ক্ষতি কি। আসল কথা জাহাজটা এখন আমাকে খুঁজে পেতে হবে। আর সেটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। এর জন্য দরকার হলে আমাকে কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত চষে ফেলতে হবে। তেমন বুঝলে প্রত্যেকটি গলি তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখবো। হেরে যাওয়া কিছুতেই চলবে না। আমার জাহাজ চাই।

এখন আমি আমার দরজার বাইরে গলির ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে। পাজামার চেয়ে গায়ের পাঞ্জাবীটা একটু বেশী ময়লা। তা, ওসব নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই এখন। আমি ভাবছি কোন দিক দিয়ে শুরু করা যায়। গলিটা সামনের দিকে তিনশো গজ সোজা এগিয়ে আর একটা বড় গলিতে মিশেছে। আমার দুপাশে জাহাজের কেবিনের মত সারি সারি বন্ধ দরজা। মুখ তুলে উপরের দিকে তাকালাম। তিনতলার একটা ব্যালকনীতে টানা পালের মত গোটা কয়েক রঙীন কাপড় ঝুলছে। বাসিন্দারা ছুটির দুপুরের ঘুম লাগিয়েছে নির্ঘাৎ। এইসব আদার ব্যাপারীদের কথা না ভেবে আমি গলির মুখে এগোতে লাগলাম। এক পা দু পা করে গলিটা ফুরিয়ে গেলে বড় গলির দৃশ্যটা অন্য রকম। এখানে দোকান পাট খোলা। দুটো মানুষ আলসে পায়ে হেঁটে যাচ্ছে। টুং টাং ঘন্টি বাজিয়ে একটা খালি রিক্সা আমাকে পেরিয়ে গেল। সব ব্যাপারটাই কিন্তু দুপুরের ঢিমে তালে চলেছে। এইসব দেখতে দেখতে সিগারেট ধরালাম। গল গল করে ধোঁয়া বেরোতে থাকলো নাক মুখ দিয়ে। এখন জম্‌পেস্‌ করে সিটি বাজাতে পারলে বেশ জাহাজ জাহাজ হয় ব্যাপারটা। তবে আমি কিনা পালতোলা জাহাজ খুঁজছি। তাই আর ওসব। প্রথমে কিংসটন ডক দিয়েই কাজ শুরু করলাম। জেটির কিনারা বরাবর জলের ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। ডাইনে বাঁয়ে যতদূর চোখ যায় অনেকগুলো জাহাজ টাহাজ দেখা গেল। অবশ্যি প্রমাণ সাইজের তেমন নেই। বেশীর

ভাগকেই স্টীমার বলা উচিত। ওর মধ্যে একটা তিন হাজার টনের দিকে নজর গেল। সেটার পাশে দুটো গাধাবোট জলের ওপর ভাসছে। লোকজন কিছু নেই। শুধু একটা দড়ির মই জাহাজের উপর থেকে জলের কাছ বরাবর ঝুলছে। ডেকের উপরে কিন্তু লোকজনের ছুটোছুটি খুব। ধুপ ধাপ ঘটাং এইরকম শব্দ উঠছে। ইঞ্জিনঘরের অনেক উপরে চিমনি দিয়ে অনর্গল ধোঁয়া বেরোচ্ছে। বেশ লাগছে আমার। ফুরফুরে হাওয়ায় চুল উড়ছে এখন। ঘামটাম শুকিয়ে গেছে গা থেকে। মনে হচ্ছে এক্ষুণি কোথাও রওনা হবো। এর মধ্যে ভোঁ ভোঁ শব্দ করে বারকয়েক হুইশিল বাজলো। উপরে তাকিয়ে দেখি কালো ধোঁয়ায় আকাশ দেখা যাচ্ছে না। কাছেপিঠে যে কটা গাঙচিল উড়ছিলো, তারাও বেপাত্তা। খুব তাড়াতাড়ি আশেপাশের হাওয়া বিষাক্ত হয়ে যাচ্ছে। মন বিগড়ে গেল তক্ষুণি। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি আয়নোস্ফিয়ারে আস্তে আস্তে জমা হচ্ছে কার্বনের মেঘ। চুপি চুপি গেরিলা সৈন্যের মত তারা ছড়িয়ে পড়বে দিকে দিকে। তারপর নেমে আসবে ট্রপোস্ফিয়ারে। একদিন হঠাৎ পৃথিবীতে সুনীল আকাশ আর দেখা যাবে না। বিশেষজ্ঞরা ঘোষণা করেছেন যে হারে বনজঙ্গল কেটে ফেলা হচ্ছে তাতে আবহাওয়ার ভারসাম্য থাকছে না। বড় বড় কলকারখানা আর কোলিয়ারীর ধোঁয়ায় এয়ার পলিউশান ঘটছে খুব তাড়াতাড়ি। এর সঙ্গে যোগ দিয়েছে কলের জাহাজের ধোঁয়া। ব্যাপার মন্দ নয়।

এইজন্যেই আমি পালতোলা জাহাজের খোঁজ করছি। ভাইকিং ক্যাপ্টেনের মত আমার জাহাজ বলটিক সাগরের কোনো অজানা দ্বীপে নোঙর ফেলবে। সবাই জেনে রাখো কলকাতায় আমি নর্ডিক জাতির একমাত্র প্রতিনিধি। এইরকম ঘোষণা করে আমার মনে খুশি খুশি ভাব এলো। এদিকে দশহাজারী জাহাজ প্রাণপণে সিটি বাজিয়ে চলেছে। কান ঝালাপালা করে দিলো ইয়ের বাচ্ছা। আমি উত্তরমুখো সটান হেঁটে গেলাম।

তো আউট্রামের গঙ্গার জলও দেখলাম একেবারে কাদাঘোলা। আশেপাশের চেহারাটা অবশ্যি খিদিরপুরের মত ঘিঞ্জি না। জলের ধারে রেলিং দিয়ে ঘিরেছে। আর একদিকে বেড়ার মধ্যে বাগান টাগান এইসব। আবার ছিমছাম রেস্তরাঁও আছে। গে'র উপরে বসে জানালার কাচ দিয়ে তাকালে নীচে ঢেউ গোনা যায়। দেখতে কিছু মন্দ লাগে না। মুশকিল হচ্ছে লোকের ভিড়ে জায়গাটার শান্তি থাকছে না কিছুতেই। কাচ্চাবাচ্চা প্রেমিক টেমিক ঝালমুড়ি আলুকাবলী টোম্যাটো সব একসঙ্গে ঘুরপাক খাচ্ছে ধোঁয়ার মত। ধোঁয়ার কথা মনে পড়তেই নজরে এলো আর একটা জাহাজ। সঙের মত দাঁড়িয়ে জেটির মুখোমুখি। একটা সিঁড়ি নামিয়ে দেয়া হয়েছে জেটির উপর। লাইন দিয়ে পিল পিল করে লোক উঠছে জাহাজে। আচ্ছা দেখাই যাক—এরকম মুখ করে আমি ভেড়ার পালে ভিড়ে গেলাম। প্রথমে দু একটা

কেবিন ঘুরে লাইব্রেরীতে ঢোকা হল। বই টই যা দেখলাম সবই প্রায় অঘা মার্কা। দু'চারটে টেকনিক্যাল যে নেই তা নয়। তবে বেশীর ভাগই বিউটি ফ্যাশান জাতীয় অথবা পর্নোগ্রাফী। ছবি দেখলে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। বোঝা যাচ্ছে ইতিহাস ভূগোল সভ্যতা এসব নিয়ে ভাবার মত লোকের বেশ অভাব দেখা দিয়েছে। তাবলে আমাকে থেমে থাকলে চলবে না। এই মুহূর্তে পৃথিবীর সমস্ত সাগরে হাজার হাজার কলের জাহাজ কার্বনের ধোঁয়া উগরে দিচ্ছে আকাশে। হাওয়া থেকে খুব তাড়াতাড়ি কমে যাচ্ছে অক্সিজেনের ভাগ। কার্টুনিস্টরা কি করছেন কে জানে। ছবি আঁকার এরকম দারুণ বিষয় তাদের মাথায় আসছে না। এদিকে বিকেল ফুরিয়ে যাচ্ছে চারপাশ থেকে। অন্ধকার হবার আগেই আমাকে দায়িত্ব নিতে হল। কি আর করা যায়। সময় তো বেশী নেই হাতে। এর মধ্যেই ইঞ্জিনঘরের ভিতরে ঘটাং ঘরর শব্দ শুরু হয়ে গেছে। লোকজনও ডেকের উপর থেকে নেমে যাচ্ছে হৈ হৈ করে। অর্থাৎ র‍্যালা দেখানোর সময় হল বাবুর। এইবার হুইশিল বাজবে অনেকক্ষণ ধরে। তারপর নাকের ফুটো দিয়ে কালো নিঃশ্বাস বেরোবে ফোঁস ফোঁস শব্দে। একটা পোড়া গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে আস্তে আস্তে। এই মুহূর্তে আউট্রামের হাওয়ায় কার্বনের ভাগ স্বাভাবিক। অর্থাৎ শূন্য দশমিক নয় তিন। কিন্তু গাছপালার যথেষ্ট অভাব আছে বলে আবহাওয়া পাল্টে যাবে খুব তাড়াতাড়ি।

এক্ষুণি আকাশের রং বিবর্ণ হয়ে যাবে। আর জলের মধ্যে অনবরত পাক খেতে থাকবে পাঁক। দু'চারটে পাখি যাও ডাকাডাকি করছিলো বেগতিক দেখে তারাও সুরুৎ কেটে পড়েছে। কিছু করতেই হবে এরকম একটা জেদ আমার মধ্যে জমা হচ্ছে। মাংসপেশীর মধ্যে বিদ্যুতের ঢেউ ছড়িয়ে পড়লো একটু একটু করে। আমি ছটফট করে জাহাজ থেকে নেমে পুবমুখো এগিয়ে গেলাম।

ময়দানের এদিকটায় লোকজন বেশী হাঁটে না। দূরে মাঠের মধ্যে ছড়ানো ছিটানো বৃক্ষকুঞ্জে দু একজোড়া তরুণ-তরুণীর স্থির ছবি। সভ্যতার এই দারুণ সঙ্কট নিয়ে ওদের কোনো মাথাব্যথা আছে বলে মনে হল না। ওরা জানে না এইসব প্রাকৃতিক কাজকর্মের নিরাপত্তার জন্যই আমার দুঃসাহসিক অভিযান। আমি মুখ ঘুরিয়ে মাঠের আরো গভীরে ঢুকে গেলাম। ভীষণ অন্ধকার একটু একটু করে আমাকে গিলে ফেললো। এখন ময়দানের বুকের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি। উল্টোনো বাটির মত মাথার উপরে উপুড় হয়ে আছে আকাশ। অনেকক্ষণ গুমোটের পর হাওয়া বইছে এখন। পঞ্চাশ হাত দূরে জাহাজের মত জেটির কাঠের পাটাতনের উপর হাঁটছি ঠিক এরকম মুখ করে আমি একটা বড় গাছের নীচে গিয়ে দাঁড়ালাম। চাপা উত্তেজনায় আমার বুক ঢিব ঢিব করছিলো। নাকের ফুটো বাঁশীর মত ফুলে উঠলো। দুহাতের পেশী দারুণ ফুলিয়ে আমি গুঁড়ি বেয়ে

উঠতে থাকলাম। গাছের রুক্ষ ছালে আমার শরীর ক্ষতবিক্ষত হতে লাগলো। নানা জায়গায় ফুটে উঠলো রক্তের আঁচড়। কিন্তু একটুও রাগ হল না আমার। লক্ষ্যের দিকে নজর তীক্ষ্ণ রেখে আমি গাছের সবচেয়ে উঁচুতে উঠে গেলাম। সেজান্ এরকম ল্যাণ্ডস্কেপের কথা কখনো ভাবেন নি। আমার মুণ্ডু এখন গাছের মাথার উপরে ভেসে আছে। নানা আকৃতির ডালপালা আমার কাঁধের চারপাশ দিয়ে ছড়িয়ে গেছে শূন্যে। দমকা হাওয়ায় কাপড়ের পালের মত ফুলে উঠছে সেগুলো। পাতায় পাতায় ধাক্কা লাগার শব্দ। অনেকগুলো পাখি ঘরে ফেরার আনন্দে কিচির মিচির করছিলো। জোনাকির আগুন ঠিকরে উঠছিলো আমার মাথায় উপরে নীচে ডাইনে বাঁয়ে। ঠিক তখন ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজলো। আকাশের দিকে তাকিয়ে আমি ধ্রুবতারাকে দেখে নিলাম। তারপর নীচের দিকে চেয়ে গম্ভীর গলায় আদেশ দিলাম—ক্যাপ্টেন মার্কোস বলছি, নোঙর তোলো।

রওনা হলাম।

প্রথমে বাঁ পা ডান হাত সামনে। তারপর ডান পা বাঁ হাত সামনে। আবার বাঁ পা ডান হাত সামনে। আমার ডান কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ। হ্যাণ্ডারে ঝুলতে ঝুলতে দোল খাচ্ছিলো। একবার সামনে একবার পিছনে। আমার মাথার চুল এখন আঁচড়ানো নেই। অল্প ধুলো জড়িয়ে আছে উপরে ভিতরে। হাল্কা হাওয়ায় রুক্ষ চুল উড়ছিলো। কিন্তু সামনে পিছনে না। এলোমেলো। শূন্যে নক্সা কাটলে অনেকটা উপবৃত্তের মত হবে। একটু শীত শীত করছে। না, ঠিক শীত না। সিরসিরে ভাব চামড়ার উপরে। অঘ্রাণের শুরুতে এ রকম হয়। তখন হাওয়ায় জল থাকে না। হিমভাব। তখন আকাশে মেঘের টুকরো থাকে না। নীল রং। তখন গাছপালায় শুকনো ভাব থাকে না। শিশিরে জড়িয়ে থাকে সবুজ পাতা। নীল আর সবুজ আমার প্রিয় রং। নীলের মধ্যে চিল উড়ে যায়। সবুজের মধ্যে শিস দেয় পাখির ঝাঁক। রওনা হবার এই ঠিক সময়।

কোন দিকে যাবো ? কোন দিক দিয়ে তাহলে শুরু করবো ? একটা ম্যাপ আছে ঝোলার মধ্যে। পথ ঘাট নালানর্দমা

জিলিপির প্যাঁচের মত। গোলক ধাঁধাঁর নক্সা পেরিয়ে যেতে হবে। আমি এখন যে গলিতে তার মাঝ বরাবর খোঁড়া। খুঁড়ে ফেলে নতুন জলের পাইপ বসানো হচ্ছে। গর্তের তুধারে মাটির স্তূপ উঁচু নীচু। পায়ে চলতে খালি হোঁচট খেতে হয়। কিন্তু পেরিয়ে যেতে হবেই। নীচের দিকে যাই হোক, আকাশ এখন ঘোর নীল। সেদিকে চোখ ছিলো বলে তু চারবার হুমড়ি খেতে হয়েছে। কিন্তু আর না। এবার সাবধানে এগোতে থাকি। সবাই সাবধানে চলাফেরা করছে। মুদিখানার ঝাঁপ খোলা। টুকিটাকি জিনিস কিনে একটি চোদ্দ পনেরোর মেয়ে উল্টোমুখে চলে গেলো। আমার ঘাড়ের উপর কাঁচা রোদ্দুরের হাল্কা ছোঁয়া। সিরসিরে অনুভূতির মাঝখানে আমি টলতে টলতে পেরিয়ে যাই ভাঙা রাস্তা মাটির ঢিবি। এখানে গাছপালা নেই মোটে। সবুজ রঙের কথা ভাবতেই পারে না কেউ। নীল রং বড্ড এক টুকরো। ধুলো ভরা হাওয়ায় ধোঁয়া মিশে ঘোলাটে দেখায় চারদিক। বাড়িগুলো মান্ধাতার আমলের। বোধ হয় সিপাহী বিদ্রোহ দেখেছে তাদের কেউ কেউ। নোনা ধরা ইট। ভাঙা কার্নিশের ফাটল থেকে অশ্বত্থের চারা গজিয়েছে। কড়ি-বরগায় কালো দাগ। ড্যাম্পের সোঁদা গন্ধ। আমার ভালো লাগে না। কি করে যে সবাই মেনে নেয় এসব। একটা ডাক এলো পিছন থেকে। থমকে দাঁড়ালাম। কে ডাকছে? বড়দি? খুকু? বড্ড গোলমাল বাড়ছে রাস্তায়। ক্রেন চলার আওয়াজ। ঝাঁকে ঝাঁকে ধুলো ছড়িয়ে

পড়ছে চারদিকে। এখন শূন্যে কণ্ডুইট পাইপের ট্র্যাপিজ খেলা। রুমাল চেপে ধরলাম নাকে।

··· এই শুভ্র—ও—ও—ও······

ফিরে তাকানো উচিত। অন্তত একবার। কিন্তু খুকু এখানে না। এই ঘোলাটে রঙের মধ্যে, এই কার্বনের বিষ হাওয়ায়, এই কড়ি-বরগা-ইট-পীচের রাস্তায়, না। তার চেয়ে আমার পিছনে এসো। চুপি চুপি। কথা বলার আগে এই জিলিপি নক্সাটা পেরিয়ে যেতে চাই।······সামনের দিকে তাড়াতাড়ি পা চালালাম। গলিটা ইংরেজী 'টি'-এর মত আর একটা রাস্তায় গিয়ে পড়েছে। অনেক বড়। রাস্তা চওড়া বলে বাড়িগুলো হঠাৎ সরে গেছে। দোকান পাট লোকজনও বেশী। গাড়িটাড়ি চলছে। টুং টুং রিক্সা। অফিসের সময় হয়েছে। ভিড় বাড়ছে পথে। ব্যস্ত লোকজন হেঁটে যায়। ইউনিফর্ম পরা স্কুলের ছেলেমেয়েরা। ট্যাক্সি-প্রাইভেট পম্ পম্। ডিজেলের গন্ধ। টুম্পাটাও এতক্ষণে কলার দেয়া সাদা স্কার্ট পরেছে। কোমরে নীল বেল্ট গলায় ছোট টাই কাঁধের নীচে অ্যানোডাইস করা সবুজ ব্রোচ্। কিন্তু থাক। এখন না। এই জিলিপির ঘোর প্যাঁচের মধ্যে না। তোদের সবাইকে এক দিন নিয়ে যাবো বলে আজ। এখন আর শীত শীত ভাব নেই। রোদের তেজ বেড়েছে বলে হাওয়া গরম। দমকা হাওয়ায় ধুলো উড়ছে খুব। আমার ঘাড়ে গলায় ধুলো কিচ কিচ করছে। চুলের রুক্ষতা আরো বেশী। বাজারের মুখে একটা জটলা

দেখতে পাচ্ছি। রাস্তার উপর টায়ার জ্বালিয়েছে কেউ। রবার পোড়া গন্ধ। অ্যাসিটিলিন গ্যাস ছড়াচ্ছে হাওয়া। C_2H_2। ঠিক এই মুহূর্তে হাওয়ায় অক্সিজেনের ভাগ কমে যাচ্ছে। ডিজেল পুড়ছে। রবার পুড়ছে। গাছ পুড়ছে। বাজার পুড়ছে। ধোঁয়ায় ঢেকে যাচ্ছে নীল। ভালো লাগে না আমার। কি যে করি। মাথার মধ্যে ঢেউ উঠছে শুধু। নীল ঢেউ। পাখি উঠছে জল ছুঁয়ে। নীল ফেনা। মা-বড়দি-খুকু-টুম্পা অনেক দূর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে সবাই। কিন্তু ডাকছে আমাকে। খুকু, তুমি কি নীলপাড় শাড়ি পরেছো? একটা লরী কানের পাশে ভেঁপু বাজিয়ে চলে গেলো। দম বন্ধ করে পনেরো কুড়ি ফুট এগিয়ে শ্বাস নিলাম! কিন্তু আশে পাশে সবাই এক রকম। কেমন নির্বিকার হেঁটে যাচ্ছে সবাই। ধোঁয়া আর ধুলো ভরে নিচ্ছে ফুসফুসে। আমার নাকে মুখে বিশ্রী গন্ধ জড়িয়ে গেছে। আঃ রাস্তা পাক খেয়ে ঘুরে গেলো।

একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছি। বাড়িটা আমার ম্যাপে নেই। এলো কোত্থেকে? এই রাস্তা দিয়ে অন্তত আঠেরো বছর চলাফেরা করছি, চোখে পড়েনি কোন দিন। তাছাড়া এরকম একটা পোড়ো ভাঙাচোরা ধ্বংসস্তূপ এই ঝকঝকে তকতকে পাড়ার মধ্যে ভাবা যায়! বেশ কিছুক্ষণ ধরে দেখছি এটাকে। ডান দিক থেকে, সামনে থেকে, বাঁ দিক থেকে। কিন্তু পিছনে যাই নি। পেছনে দেখতে গেলে ভিতরে ঢুকতে হয়। ভাবছি ঢুকবো কিনা। বাড়িটা দেখতে অদ্ভুত।

বেশ উঁচুও। একবার মনে হল পুরোনো কেল্লার মত, ভাঙা খিলান, পাথুরে চাতাল, এই সব। আবার বাঁ দিক থেকে একেবারে তিরিশ হাজার টনের যুদ্ধ জাহাজ, হুকুম পেলেই কামান দাগতে শুরু করবে। কে জানে ভিতরের পাটাতনে কোনো ক্যাসাবিয়াঙ্কা অপেক্ষা করছে কিনা। কৌতূহল যে বাড়ছে তাতে সন্দেহ নেই। লক্ষ্য করলাম পথ চলতি দু একজন একবার আমার দিকে আর একবার বাড়িটার দিকে অবাক তাকিয়ে গেলো। অবশ্য তাতে আমার মনোযোগ কিছু কমলো না। তাছাড়া জাহাজের কথা ভাবলেই একটা নীল নীল ভাব মনে এসে যায় আমার। নীলজল-নীলসাগর-নীল আকাশ-নীলপাখি-ফ্রিগেট-অ্যালবাট্রস। পা বাড়াতে হোঁচট খেলাম। না, পাথর না। কংক্রীটের একটা চাঁই। তোরণ ঘরের ছাদ থেকে খসে পড়েছে। চাতাল বলে বিশেষ কিছু নেই এখন। ভেঙে চুরে একসা। পাথর খুবলে মাটি বেরিয়ে পড়েছে কোথাও। গথিক খিলানের ভাঙা টুকরো। সামনের দেওয়াল বেমালুম উবে গেছে। ভিতর বাড়িতে ঢোকার মূল দরজা এক সময় ছিলো। এখন চৌকো কাঠের ফ্রেমটা শুধু সার্কাসের ক্লাউনের মত ছাদের সঙ্গে ঝুলছে। ফ্রেমের মধ্যে দিয়ে পিছনের দেয়ালে আর একটা দরজা। সিঁড়ি-ঘরের ভিতর পা দিতেই দপ করে আলো নিবে গেলো। মানে দারুণ অন্ধকার। আর পচা দুর্গন্ধ আসছে কোত্থেকে। চোখ কুঁচকে দম আটকে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। একটু পরে অন্ধকার

সয়ে এলে আবছা দেখা গেলো সব কিছু। সব, মানে মেঝেতে তিন ইঞ্চি পরিমাণ ধুলো, এলোমেলো ছড়ানো ইটের টুকরো, দেয়াল থেকে খসা বালি-সিমেন্টের চাঁই। নোনা ধরা দেয়ালে বয়সের দাগ, মাকড়সার জাল, ছাদ আর দেয়ালের কোণে বটের ঝুরির মত ঝুলের জঙ্গল। একটা ধাড়ি মেঠো ইঁদুর আমার সাড়া পেয়ে ধুলো খচমচ করে ছুটে গেলো বাইরে। ছোটো খাটো ঝড় উঠলো একটা। নাকে রুমাল দিলাম। সিঁড়িটা এখন পুরোপুরি ধ্বংসস্তূপ। ভেঙে চুরে রাবিশের ঢিবি হয়ে উঠেছে। ঢিবির উপর পাখির খাঁচার মত বসে আছে একটা ঘর। ঘর না বলে দোতলার দর-দালানের গেট বলা উচিত। খুব সাবধানে পাহাড়ে উঠতে থাকলাম। উঁপরে উঠে দেখি পিছন দিকটা ভেঙে পড়েনি একেবারে। লম্বা বারান্দার বাঁ দিকে সারি সারি গোটা কয়েক ঘর এখনও টিঁকে আছে। অনুমান করলাম একই অবস্থা। কিন্তু ভিতরে যেতে সাহস হল না। লম্বা বারান্দার বাঁ দিকটা এক্কেবারে হাট করে খোলা। এক সময় রেলিং ছিলো বোধ হয়। কিন্তু এখন আর নেই। আমি এখন বেশ উপরে দাঁড়িয়ে আছি। উঁচু থেকে নীচের বাগান চোখে পড়ছে। কেউ সখ করে করেছিলো একদিন। কত দিন আগে ? একশো বছর ? খুব সৌখীন ছিলেন নিশ্চয়ই। দেউড়িতে সকালে সন্ধ্যায় ঝমর ঝম বাদ্যি বাজতো। আর বাবু রূপোর গড়গড়ায় অম্বুরী তামাকের সঙ্গে বাগানের ফুরফুরে হাওয়া খেতেন। কিন্তু এখন জঙ্গল চারদিকে। ফোয়ারার জল শুকিয়ে আগাছা

জন্মেছে। বুনোঝোপ, আশশ্যাওড়া। পাখি এখন খাঁচা ছাড়া। আর বাগান ঢুকে পড়েছে জঙ্গলের বুকে। বাইরে ফুটফুটে রোদ্দুর। কিন্তু গোটা বাড়িটা ছায়ার আড়ালে ঘুমিয়ে আছে কত দিন। ছায়ার মধ্যে চলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। চুপ চাপ জঙ্গল নড়ছে একা একা। মনে হয় একটু শব্দ হলেই ঘুম ভেঙে যাবে কার। বুড়ো কেদার চাটুজ্যে লাঠি ঠক ঠকিয়ে ঘর থেকে উঁকি মারবে। ······আঃ মা-বড়দি······বড্ড পুরোনো হয়ে গেছে সব ······খুকু···বড্ড একঘেয়ে চারদিকে······এখন আর শুধু শুধু ডেকো না, বুঝলি টুম্পা, এখানে কক্ষণো না······ এই ভাঙাচোরা—নকল—ফেলে দেয়া পচা রাবিশের মধ্যে কোন নীল নেই। থাক। ক্যাসাবিয়াঙ্কা যুগের পর যুগ অপেক্ষা করে থাকুক। আমি কোনো হুকুমের তোয়াক্কা করি না। নীলের জন্য বিদ্রোহ আমার, সবুজের জন্য। তোদের সবাইকে একদিন নিয়ে যাবো বলেই তো। ধ্বংসস্তূপ পায়ে মাড়িয়ে রাস্তায় নামলাম।

পথ আগের মতই। সবাই কাজে অকাজে দৌড়ে যায় ছকে বাঁধা। মাকড়সা জাল বোনে অন্ধকারে। টিকটিকি শিকার ধরে। আরশোলা ছায়ায় সরে যায়। বাস স্টপে চেনা মানুষ একজন।

কি রে যাচ্ছিস ?

হ্যাঁ ?

তাহলে ?

আমি হাসলাম শুধু। কিন্তু এগিয়ে গেলাম সামনে। গলির পর গলি পার হয়ে যাই। এঁকে বেঁকে পাক খেয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে। রাস্তার পর রাস্তা। রাজপথ। তারপর আবার গলি। জিলিপির প্যাঁচ খুলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। জিক্‌সা পাজ্‌ল আমাকে ঠকাতে পারবে না। পথ ছড়িয়ে যাচ্ছে সামনে, চওড়া হচ্ছে, উধাও। গাড়ি চলছে। লোকজন। দোকান। সময় কত লাগবে জানি না। কিন্তু টের পাচ্ছি একটা কিছুর। খুকু-মা-বড়দি তোমরা থেমে থেকো না। থেমে থাকা বড্ড একঘেয়ে। তার চেয়ে চলতে থাকো। চলতে চলতেই একদিন নীল সবুজ···নীল সবুজ···নীল······

একটা ভুল হয়েছিলো কোথাও।

আমার নাক, আমার চুল, আমার মুখের গঠন, হাইট, মায় গোটা কাঠামোটাই ঘেন্না করার মত। ধারণাটা আমার না, অন্যের। তবে আমিও বিশ্বাস করি এখন। ছেলেবেলার কথা বাদ দেয়া যায়। কবে মায়ের কোল থেকে মাটিতে নেমেছি এখন আর মনেই পড়ে না। কিন্তু চোদ্দ পনেরোর দিকে তাকিয়ে দেখতে পাচ্ছি হাড় ডিগডিগে একটি অনাথ ছেলেকে। প্রায় জাঙিয়ার মত খাটো নোংরা প্যান্ট, গায়ে তেলচিটে জামা, ধুলো জড়ানো চুল মাটির উপর ঝুঁকে পড়েছে। পাশের ঘরে মামীর গলা শুনতে পেয়ে ঘাড় শক্ত। বোধহয় খুব লজ্জা হচ্ছে এরকম ভাব করে মুখে তুলছে পুঁইশাকের ঘন্টমাখা ঠাণ্ডা ভাতের ডেলা। কিন্তু থাক। এসব ভ্যান্‌তারা কেউ পছন্দ করবে না। ষাট কোটি লোকের গল্প একরকম। মাটি কামড়ে পড়ে থাকার গল্প। আস্তে আস্তে মরে যাওয়ার গল্প। আমি একটু ঘুরিয়ে নাক দেখাবো সবাইকে। এই যেমন গোড়াতেই ভুলের কথা বলেছিলাম। ভুল করেছিলেন শ্রীযুক্ত ভগবানবাবু। ভগবানবাবুর উপাধি জানি না, ঠিকানা কোথায়, তাও। শুনেছি কেউ কেউ তার শুলুক সন্ধান জানেন, খবর রাখেন। কিন্তু

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আমার মত একটি অপদার্থ তৈরীর দিকে তাঁর মন গেলো কি করে, এটা ভাবলেই আমার অবাক লাগে। এবারে তথ্যগুলো জানিয়ে দিই সবাইকে।

নাম অঘোরনাথ খাঁ (বাঁড়ুজ্জে, চাটুজ্জে, গাঙ্গুলি বা ঘোষ-বোস-রায় হতে পারতো), লম্বা ছ' ফুট এক ইঞ্চি, গায়ে এক ছটাক মাংস নেই, পাঁজরা বেরোনো খ্যাংরাকাঠি, রঙ তালের মত মিশকালো (অন্তত উজ্জ্বল শ্যাম হলে কি ভারতবর্ষের ইতিহাস পাল্টে যেত), উপরের মাড়ির দুটো দাঁত সব সময় মুলোর মত বাইরে বেরিয়ে থাকে, খোঁচা চুল সিড়িঙ্গের মতো খাঁড়া, হাইটের তুলনায় মাথা একটু ছোটো। মামী ঠাট্টা করে ডাকতেন কেলেবাঁশ। ঘরে বাইরে সেটাই চালু হয়ে গেলো। কিন্তু শুনেই কুঁকড়ে যেতাম আমি। তখন বুঝতাম না যাকে যা মানায় তাতে লজ্জা পেতে নেই। ঘসে ঘসে পার্ট ওয়ান অবধি বিদ্যের দৌড়। পরীক্ষা দেয়া হয়নি। তার আগেই একটা ছোটো রঙের কারখানায় একশো পঁচিশ টাকা মাইনের কেরানী হয়ে গেলাম এইভাবে আমার হেরে যাওয়া শুরু হলো।

আমি এখন ভবানীপুরের একটা মেসে আছি প্রায় সাত বছর। একশো পঁচিশ এখন তিনশোয় দাঁড়িয়েছে, আর বয়সটা উনতিরিশের দোরগোড়ায়। এছাড়া সব কিছু মোটামুটি এক। বন্ধুদের চারজন বাইরে চলে গেছে। যারা কলকাতায় আছে, আগের মতই আমাকে পাত্তা দেয় না।

আমি যেচে তাদের আড্ডায় যাই, যোগাযোগ রাখি। মাথা ঘামায় না কেউ। বেশী কথাও বলে না আমার সঙ্গে। ওদের আলোচনার বিষয়গুলো মোটামুটি তিনজাতের। এক নম্বর প্রোমোশন হয়ে কার তিনশো টাকা মাইনে বাড়লো, বা এবারে কত পারসেন্ট ইনসেন্টিভ বোনাস দেবে, অথবা পার্চেজের চোপরা সাহেব বছরে কত টাকা ঘুষ থেকে কামান এইসব। আমি আদার ব্যাপারী চুপ করে থাকি। দু নম্বর তাদের প্রেম-টেম। গার্ল ফ্রেণ্ডের বার্থডে পার্টিতে কে গোল্ড-ব্যাণ্ড রিস্টওয়াচ প্রেজেন্ট করেছে, মড্ প্রেমিকা কবে নেশার ঝোঁকে চুমু অফার করেছিলো, বা কে ছ'মাসের মধ্যে সেটল্ করবে ইত্যাদি। এখানে অবশ্য আমি দু-এক কথা বলার চেষ্টা করেছি। কিন্তু ওরা এমন চোখে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েছে যার মানে, কেলেবাঁশ তার গণ্ডীটা ভুলে গেছে নাকি! এরপরেই সিনেমার হিরোইন এসে যায়। রেখা বা সারিকার ভাইটাল স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স নিয়ে গরম আলোচনা। চুপ করে থাকা ছাড়া আমার কিছুই করার নেই। ওরা ওদের ফাঁকা সময় এই নিয়েই কাটিয়ে দেয় কিনা আমি জানি না। মেয়েদের এসব ব্যাপারে আমি ভিতরে যদিও খুবই অশ্লীল, কিন্তু মুখে কথা ফোটে না, মেনিমুখো বিড়াল। নিজেকে নিয়ে আমি সব সময় মরমে মরে থাকি। আমি সুর ভালবাসি, গাইতে পারি না। আমি ফুল ভালবাসি কেনার পয়সা নেই। বাচ্চা ছেলেমেয়ে

দেখলে জড়িয়ে আদর করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু আমাকে দেখে ভয় পেয়ে কেঁদে ওঠে শিশু। মউ-এর দিকে চেয়ে আমার বুক টিপ টিপ করে, কথা বলতে ইচ্ছে হয়। মউ ফিরেও তাকায়নি কোনোদিন। একা ঘরে আমি নিজেকে অনেকদিন প্রশ্ন করেছি, আমার জন্ম কোন খেয়ালে, কেন? যত ছড়িয়ে পড়তে চাই চারপাশ ছোট করে আনে আমার পরিধি।

'একদিন লাইন ভেঙে বাইরে যাবোই—'

গাছের নীচে দাঁড়িয়ে একা ফিসফিস করি আমি। আকাশের দিকে মুঠো করা হাত তুলে দাঁড়াই। আবার হেরে যাই, হেরে যেতে থাকি। এই নিয়েই···

কারখানায় যাওয়ার সময় রোজ বাস স্টপে মউ-এর সঙ্গে দেখা হয়। ঠিক বলা হোলো না। মউ না, আসলে আমি দেখি মউকে। লম্বা ছিপছিপে চেহারা, যাকে বলে উজ্জ্বল ফর্সা রঙ, টিকোলো নাক, পাতলা ঠোঁটে লিপস্টিকের হালকা ছোঁয়া। ছু'চোখে মউ বোধহয় সব সময় স্বপ্ন দেখে। ও যেদিন আগুনরঙা শাড়ি পরে আসে খুব আনন্দ হয় আমার। চমৎকার গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে হাওয়ায়, ফাঁকা হয়ে যায় ঘিঞ্জি শহর, কোথায় পাখি ডাকে। আমার ইচ্ছে করে সারা তল্লাট আলোয় সাজিয়ে দিই, গ্লোব নার্শারির ফুল মুঠো মুঠো দান করি চেনা অচেনা সবাইকে। আর একদিন এক বৃদ্ধ বুড়ো ভিখিরি হাত পেতে দাঁড়িয়েছিলো ওর সামনে।

মউ মুখ ফিরিয়ে বাসে উঠে গিয়েছিলো চুপচাপ। খুব দুঃখ পেয়ে মনে মনে বলেছি, এ লজ্জা তোমাকে মানায় না মউ। স্নেহ-করুণা-প্রেম শুধু তোমার জন্যে। ওর হয়ে কল্পনায় এক টাকা দিয়ে দিয়েছি বুড়োকে। ওদিকে দার্জিলিঙ পাহাড়ের মাথার আকাশ নীল হয়, সাইবেরিয়ায় ফিরে যায় বিদেশী পাখি, কার্জন পার্কে মেয়ের সংখ্যা বাড়ে, সিকিউরিটি কাউন্সিলে ফকল্যাণ্ড সমস্যা তুমুল ঝড় তোলে, সুঠাম প্রেমিকের সঙ্গে মউ সন্ধ্যেবেলা আউট্র্যামে যায়, বন্ধুদের আড্ডা আরো জোরদার। আমি আট আনা দিয়ে একটা পুরোনো বই কিনে আনি। পঁচাত্তর পৃষ্ঠার বই এক সময় ভালো কাগজে ছাপা হয়েছিলো। এখন পাতাগুলো ঘোর লাল, ধার দিয়ে অর্ধেকের বেশী পোকা লাগা। আমার পক্ষে আট আনা পয়সা এভাবে খরচ করা ঠিক না, তাও আবার বাজে খেয়ালের জন্য। তবে 'জাতকের গল্প' নামটা এমন টানলো। রাতে পাতা উল্টে দেখি ও হরি, এতো জ্যোতিষ-টোতিষ না, স্রেফ গুলগপ্পো। আর একদফা ঠাট্টা-তামাসা হবে এই ভেবে বন্ধুদের কাছে চেপে গেলাম।

ঠিক করলাম পাল্টাতে হবে সব কিছু। আমার চোখ-মুখ, আমার চুলের ভাঁজ, গায়ের রঙ, আমার কথা বলার স্টাইল, পোশাক-টোশাক। একটা খোলসের মধ্যে ঢুকে পড়বো আমি। কেউ যেন বুঝতে না পারে। আমার বিবর্তন শুরু হবে এইভাবে। তলে তলে প্রস্তুতি চালালাম। তার আগে

কিছু বাড়তি টাকার দরকার। দেড় মাসের চেষ্টায়, অল্প মূলধনে দুটো অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ করলাম। নগদ সম্মান সাতশো টাকা জুটলো। নিজেই নিজের পিঠ চাপড়ালাম তখন। এই ব্যবসাই চলতে থাকবে। ঠিক আছে আমার গাড়ি এবার আর থামবে না। যা হোক খুঁজে পেতে কলেজ স্ট্রীটে একটা ছোট এঁদো ঘরে উঠে গেলাম হঠাৎ। কাউকে ঠিকানা জানাইনি। চেনা লোক দেখলে উল্টোদিকের গলি দিয়ে টুক করে কেটে পড়ি। এখন কিছুদিন দূরে থাকতে হবে সকলের। বন্ধুদের ছায়া মাড়াই না। আমার বেপাত্তা নিয়ে ওরা মাথা ঘামাবে না অবশ্য। এবার আসল কাজ শুরু হলো। প্রথমে বাঁশের কঞ্চি, খড়, আর পাটের দড়ি কিনে আনলাম। তারপর এলো ফর্সা স্কিনকালার নাইলন কাপড়, কোঁকড়া সোনালী চুলের নিখুঁত উইগস, চোখের জন্য নীল রঙের কনট্যাক্ট লেন্স, হালকা পালকের প্যাড, সুঁচ-সুতো আরো নানান টুকটাকি। এসব জোগাড় করতে ছ'মাস পেরিয়ে গেলো। আমার সমান হাইটে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে ফ্রেম বাঁধলাম। তার উপর খড়ের ঢাকা পড়লো। আস্তে আস্তে ফুটে উঠলো হাত পা শরীর মুখ। পুরো একটা মানুষের কাঠামো। এসব কিছুই হুট করে তৈরী হয়নি। রাতের পর রাত অমানুষিক পরিশ্রম করেছি আমি। সকলের চোখের আড়ালে চুপি চুপি চুপি আমার বিবর্তনের কাজ এগিয়ে গেছে। আমার মডেলের মাপে

নাইলনের সীট্ কেটেছি। মাথা থেকে পা অবধি খোলসের লাইনিং-এর ভিতর পুরে দিয়েছি নরম পালকের প্যাড্, চোখের মণিতে কনট্যাক্ট লেন্স লাগিয়ে অভ্যেস করেছি সহজ চলাফেরা, কথা বলার ভঙ্গি। আরো কত কি। এক বছর পর একদিন খোলসের ভিতর ঢুকে বাইরে দিনের আলোয় এসে দাঁড়ালাম।

এখন আমার গায়ের রঙ তামাটে ফর্সা, চোখ ঘন নীল, মাথায় কোঁকড়া সোনালী চুল উপছে উঠেছে, মেদহীন সুঠাম চেহারা। প্রথম কয়েকদিন এলোমেলো হেঁটে গেলাম পথে। চেনা রেস্তোরাঁয় চা খেলাম। পরিচিত মানুষের সামনে গিয়ে কাল্পনিক ঠিকানা জানতে চাইলাম। তারপর দু' প্যাকেট ফরেন সিগারেট নিয়ে বন্ধুদের আড্ডায় হানা দিলাম। যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। আমাকে দেখে লাফিয়ে উঠতে ভুলে গেলো তারা। বোবা চোখে তাকিয়ে রইলো। একজন শুধু অনেক পরে উঠে এসে সাবধানে কথা বললো।

'অঘোর তো রে! কি আশ্চর্য!'

আমি একে একে দামী সিগারেট অফার করলাম সবাইকে। এক হাজার মিথ্যে কথা গড় গড় করে বলে গেলাম অনায়াসে। এবার অবস্থা পাল্টে গেছে। আমি নতুন কথা বলে যাবো। ওদের থামিয়ে এখন আমার কথা বলার পালা। মিথ্যে একদিন সত্যি হয়ে উঠবে নিজের গরজে। যেমন আমি। কাল পূর্ণ হলে আমি খোলস থেকে বেরিয়ে

আসবো। জন্মান্তরের পথ বেয়ে সিদ্ধির লক্ষ্যে এগিয়ে যাবো আমি। তার আগে মউ-এর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। ওর ছোঁয়ায় হাওয়া এখনো সুগন্ধ ছড়ায় কিনা জানি না। ওর প্রেমিকা কি এখন আমার চেয়ে সুন্দর ?

বাস স্টপে আমাকে দেখে এই প্রথম মিষ্টি হাসলো মউ।

'তুমি বদলে গিয়েছো।'

আমি জানতাম এরকম হবে। তবু আমার চার পাশে লক্ষ কোকিল ডেকে উঠলো। ফুটফুটে রোদের মধ্যে চাঁদ উঠলো আকাশে। অসময়ে জোয়ার এলো নদীতে। কিন্তু সাবধান হলাম আমি। আমার ব্যবহারে অস্থিরতা প্রকাশ পেলো না কোথাও, উচ্ছ্বাস না। শান্ত গম্ভীর গলায় আমি মউকে বললাম 'তোমার আজ অফিসে না গেলেই নয় ?'

দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট চেপে ধরে একপলক তাকালো মউ, মুখ নিচু করে বললো, 'আচ্ছা।'

এভাবেই বদলে গেলো সব। পৃথিবী পাক খায় নিজের অক্ষদণ্ডে, সৌরকলঙ্ক নিয়ে হৈ-চৈ করে বিজ্ঞানী দল, সুমেরুবৃত্তে বরফের স্তর আরো পুরু হয়। সময় গোপনে ছুরি শানাচ্ছে। কেউ খবর রাখে না পঞ্চম হিমযুগ কবে শুরু হয়ে গেলো। আমি চলাফেরায় এখন দারুণ স্মার্ট, কথায় চৌখস। যেখানে দাঁড়িয়ে পড়ি চারপাশে ভিড় করে আসে মানুষ। আড্ডায় আমি কেন্দ্র। অর্ডার সাপ্লাই ব্যবসায়ে লাভ বেড়ে যাচ্ছে। তাই দুহাতে টাকা ছড়িয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছি সবার। এখন আমাকে ছাড়া

আর কিছু ভাবে না মউ। আমার বিবর্তন কত তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেছে সে খবর শুধু আমিই জানি। আরো এক বছর বয়স বাড়লো আমার।

চকচকে রেস্তোরাঁয় জন্মদিনের নিমন্ত্রণ জানালাম সবাইকে। এবার পরীক্ষা। অনুষ্ঠানের দিন ঘরে বসে টুকটাক কাজ সেরে নিলাম। ফল মোটামুটি জানা। অভিজ্ঞতা আমাকে এখন জ্ঞানবৃদ্ধ করে তুলেছে। সে যাক। অনেকদিন পর খোলস থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। তারপর সন্ধ্যে হলো। এক সময় হৈ-হৈ করে রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়লো বন্ধুরা। অভিনন্দন জানিয়ে এগিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ ভূত দেখে থমকে গেলো। আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে সবাইকে উইশ করলাম।

'আমাকে চিনেছো তোমরা?'

একজন গম্ভীর মুখে জিজ্ঞেস করলো—

'তুই তো কেলেবাঁশ, তুই এখানে কেন?'

আমি বললাম, 'আমি অঘোরনাথ।'

তক্ষুণি গুমরে উঠলো ভেতরের হাওয়া। কোনো কথা না বলে মুখ ফিরিয়ে চলে গেলো মউ। আমি ওর অবজ্ঞা দেখে হেসে ফেললাম। বন্ধুরা তীব্র প্রতিবাদ করলো আমার কথার, অপমান করলো, খিস্তি দিলো। তারপর খুশি মুখে ফিরে গেলো পুরোনো আড্ডায়।

আমার এঁদোঘরের মাথায় এখন সত্যিকারের চাঁদ উঠেছে। রাতের ফুল গন্ধ ছড়িয়ে দিচ্ছে হাওয়ায়। কয়েকটি জোনাকি

কোন ফাঁকে ঘরে ঢুকে পড়েছিলো। এখন অন্ধকারে তারার মত জ্বলছে-নিবছে। গোটা ঘর আকাশ হয়ে গেলো না কি! তখন যত্ন করে মডেলের গায়ে খোলস পরিয়ে দিলাম আমি। মাথায় দিলাম নকল চুল, আর চোখের তারায় নীল কাচ। এখন সহজ হয়ে গেছে সব। কোথাও কোন দাগ নেই। খোলসকে প্রশ্ন করলাম—

'বল তো তুমি কে?'

খোলস মুচকি হেসে জবাব দিলো,

'অঘোরনাথ।'

আমি বললাম,

'তাহলে আমি কে!'

'জাতক।'

লাইনের উপর থেমে ছিটকে যাবে নাকি! এত জোরে ছুটছে কেন? কেন এত জোরে ছুটছে? ওই স্টেটবাসটা? ব্রেকডাউন ভ্যানের মত কালীঘাটের মোড়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। আমি দেখেছি। তাহলে আজ সবকিছু উল্টোপাল্টা হচ্ছে কেন? কেন? আলু শীতে জন্মালেও সারা বছরের খাবার। আর আলুর অ্যাটম ভাঙলেও যা, মানুষেরও তাই। এমনকি এই ট্রামের বডিটারও। যাকগে। আলুর মধ্যে অনেক বর্ণ, অনেক জাতিভেদ। তার কয়েকটির নাম আমি জানি বাজারে ওঠে।

বাজার। মানে যেখানে মাছ-মাংস-সব্জী এইসব বিক্রী হয়। আর হ্যাঁ আলুও। এখন দারুণ গরম কলকাতায়। ফারনেসের মধ্যে গনগনে আগুন। তাপ ছিটকে উঠছে বাইরে। ছিটকে উঠে দুপাশ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। আমি দারুণ বেগে ছুটে যাচ্ছি সামনের দিকে। ওরা হাওয়ার মত ছুটে আসছে আমার দিকে। কিন্তু ধাক্কা লাগছে না। একটা ট্রাম। ট্রাম ছুটছে সামনে। একটা বাস। বাস ছুটছে পিছনে। বেড়ে মজা। আমার এখন টুম্পার মত হাততালি দিতে ইচ্ছে করছে। কেউ দৌড়োচ্ছে ওদিকে। কেউ এদিকে। কারখানার মধ্যে ফারনেসের আগুন তাপ ঠিকরে উঠছে। খরায় ধুঁকছে কলকাতা। সকালে বাজারে গিয়ে দেখি কেলোর কীর্তি

পেঁয়াজ তিনটাকা, একটা শাঁসওঠা মূলো আটআনা, কদমফুল সাইজ ফুলকপি দেড়, আর আলু নেই।

···নেই কেন?

···নাসিকে গোলমাল।

···নেই কেন?

···লোডশেডিং।

টুক করে কেটে পড়েছি বাব্বাহ্। কিন্তু এখন একটুও গরম লাগছে না আমার। ট্রাম ছুটছে সামনে। ট্রাম। হাওয়া ছুটছে পিছনে। হাওয়া। হাওয়ার শব্দ। আর পাতার। টেনিস মাঠের দিকে মুখ করে ওই রাধাচূড়া গাছটা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে রোজ। এক্কেবারে একঠেঙে বক। কিন্তু এক্ষুণি সাঁ সাঁ ছুটে গেলো পূবমুখো। দুটো ঝরঝরে স্টেটবাস তাড়া করে গেলো গাছটার পিছনে। ট্র্যাফিক জ্যাম হবে কিনা ভাবছে না কেউ। একবার ও আগে এ পিছনে তারপর এ আগে ও পিছনে। ছেলেবেলায় আমি ওরকম চু কিত্ কিত্ খেলেছি। ছেলেবেলায় সবাই চু কিত্ কিত্ খেলে। দারুণ ব্যাপার। এখন আমি তীরের মত সামনের দিকে। আর আমার চুল। এখন আমার সারা গায়ে ফুরফুরে হাওয়া। সেরকম তাড়া কিছু নেই। বেশ লাগছে। কিন্তু অন্য সবাই খুব ব্যস্ত। অন্যেরা সাধারণত ব্যস্ত থাকে। আমি থাকি না। ওসব ভেবে কি হবে। চারটের মধ্যে পৌঁছলেই চলবে আমার। ব্যস্।

*　　*　　　　*　　*

লেক মার্কেট লেক মার্কেট।

টং টং টং।

দাদা কি ডিফেন্সে আছেন?

কেন?

খারাপ জায়গায় ডজ্ করছেন যেভাবে।

আমার ঘড়িতে এখন দুটো বেজে চোদ্দ মিনিট। পাশের লোকটার ঘড়িতে এখন দুটো সতেরো। অনেকের ঘড়িতে এখন দুটো বারো থেকে দুটো বত্রিশ। সবার ঘড়ির কাঁটা আলাদা আলাদা ঘুরছে। ট্রামের চাকা ঘুরছে সামনের দিকে। রেল আর চাকায় শব্দ উঠছে ঘড়-ড়-ড়-ড়-ঘটাং। ট্রামের চাকা গড়গড়িয়ে। আগুনের ফুলকি ছিটকে উঠছে। জানলার পাশে আমি উটের মত গলা বাড়িয়ে। ফুরফুরে হাওয়ায় এখন আমি। আর আমার নাক। আর আমার কান। আর আমার চোখ টোখ। এইসব। দরজার মুখে আলুর মতো গড়িয়ে পড়ছে লোক। আলু সারা বছরের খাবার। আজ বাজারে নেই। কাল উঠবে বোধহয়। আলুর মধ্যেও অনেক বর্ণভেদ। প্রত্যেকের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। দু টাকা দশ থেকে দু টাকা আশি। সময় বাড়ছে আলুর দামের মত। বন বন কাঁটা ঘুরছে সকলের হাতে। সব কাঁটা এখন একদিকে ঘুরছে। সামনে। আর ট্রামের

চাকাও ঘ-ড়-ড়-ড় ঘটাং ঘটাং। আলুর বস্তা বোঝাই করে উনত্রিশ রুটের ট্রামটা ছুটে গেলো টালিগঞ্জের দিকে। চান্স পেলেই শালা পৃথিবীর আলুওলাদের! যাকগে। ডানদিকে সবাই ছুটে যায় উল্টোমুখো। ট্রাম-বাস-মিনি -প্রাইভেট। ওদিকে আর এদিকে সবাই। চিল্লাচ্ছে কে? হাওয়া অফিসটা কাছে এসেই সুরুৎ করে কেটে পড়লো। আমার ঘড়িতে এখন দুটো বেজে চৌত্রিশ। পাশের লোকটার ঘড়িতে দুটো সাঁইত্রিশ। অনেকের ঘড়িতে এখন দুটো বত্রিশ থেকে দুটো বাহান্ন। জিয়াজী স্যুটিং-এর মডেলের মত স্টাইল করে মুখ ঘোরাচ্ছে পাশের লোকটা। খিদিরপুরের মোড়ে ফুটফুটে রোদের মধ্যে ঘড়ির কাঁটা ঘুরছে। আমি আগে গেলেও যা, একঘণ্টা পরে গেলেও তাই। ন্যাশনাল লাইব্রেরীর পুরোনো খবরের কাগজের বিভাগ চারটে অবধি খোলা থাকে। ঘ-ড়-ড়-ড় ঘটাং টং টং আজ শুধু রিকুইজিশান স্লিপ দেবো।

*   *   *   *   *

চোরে চোরে কি যেন হয়। তা এই কথাটা মনে রাখলেই আর কোনো গোলমাল থাকে না। আনন্দের কথা বেশীর ভাগ লোকই এ ব্যাপারে পাকাপোক্ত। শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে আমিও শতকরা নিরানব্বুই জনের দলে। মনে রাখতে হবে আমি সমাজের বাইরে থাকি না। আর এও জানি আমার

আপনার সম্পর্কের উপরেই দেশ গাঁয়ের ঠিকানা বা চিঠি টিঠি· এইসব।

ইয়ে দা কোত্থেকে ?

মাসতুতো ভাইয়ের দেশ থেকে।

হঠাৎ ?

একটু আলুর ব্যবসা ট্যাবসা—

*　　*　　*　　*　　*

তো ফোর্ট উইলিয়ামের সামনে রাস্তায় ট্রাম-বাস-মিনি-প্রাইভেট সব আলু হয়ে গেছে। আইল্যাণ্ডের উপর ট্র্যাফিক পুলিশ সাদা আলুর মত। কাঞ্চন নগরের ছুরি-কাঁচি, কৃষ্ণনগরের পুতুল আর চন্দ্রমুখী আলু ভারত বিখ্যাত। আলুর মাথায় সবুজ হেলমেট রোদ্দুর ছিটকে পড়ছে। কেউ বস্তা বস্তা আলু ছড়িয়ে দিয়েছে সামনের দিকে। রাস্তা আড়াল করে গড়গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে আলু। আরামবাগের আলু, নদীয়ার আলু, কাটোয়া-বর্ধমানের আলু, হিমঘরের আলু। যাচ্চলে। এদিকে আমি সামনের দিকে ঘ-ড়-ড়-ড় ঘটাং টং-টং। ডানদিক দিয়ে ছুটো খড় বোঝাই লরী গোঁ গোঁ। একটা প্রাইভেট সাঁ্যাৎ। মিনিবাস শোঁ···ও···ও। বাঁদিকে কেল্লার ময়দান প্লেয়ারের ডিস্কের মত আস্তে আস্তে ঘুরে যাচ্ছে। হোর্ডিং থেকে অমিতাভ বচ্চন স্মার্ট হেসে এগিয়ে আসছে। আমি জানলা দিয়ে ঝুঁকে টা টা

করতেই। ভোঁ-ও-ও-ও। পিছনে দৌড়ে যাচ্ছে সবাই। আমার উল্টোমুখে হাওয়া ছুটছে। পিছন দিকেও। ঘ-ড়্-ড়্-ড়্ ঘটাং। চুপ।

*   *   *   *   *

একটা লরী তেরছাভাবে দাঁড়িয়ে লাইনের উপর। গিয়ারবক্স ফেটে গেছে। রাস্তা জ্যাম্। কৃষ্ণনগরের সাদা পুতুল ভিড় সামলাচ্ছে। ময়দান ফাটিয়ে হল্লা করছে ছেলেরা। এখন লোহার চাকা বন্ধ্। মেয়ো রোডের মোড়ে গনগনে আগুনের মধ্যে বাপুজী চুপচাপ নির্বিকার। জেব্রা ক্রসিং-এর উপর গড়াগড়ি খাচ্ছে হরেকরকম আলু। সব এক্ষুণি থেমে। আগেও এরকম অবাক কাণ্ড দেখেছি। আমি দাঁড়ালেই সব থেমে গেলো। আর চলতে শুরু করলেই সবাই অমনি গড়গড়িয়ে। বরাবর এই রকম। ট্রাম-বাস-মিনি-ট্যাক্সী সব এখন চুপ। কিন্তু আমি চলতে শুরু করলেই। অবশ্য ব্যস্ত হবার কোনো কারণ নেই আমার। ঘড়িতে মাত্র দুটো সাতচল্লিশ। আমার পাশের লোকটার ঘড়িতে দুটো পঞ্চাশ। অনেকের ঘড়িতে এখন দুটো পঞ্চাশ। অনেকের ঘড়িতে এখন দুটো পঁয়তাল্লিশ থেকে তিনটে পাঁচ। সব কাঁটা একসঙ্গে ঘুরছে বন্ বন্। ঘড়ির কাঁটার মত ট্র্যাফিক পুলিশের হাত ঘুরছে। ওই তো ওই যে ভিড় কমে যাচ্ছে জেব্রা ক্রসিং-এর উপর। পথ ফাঁকা হয়ে

যাচ্ছে। লরীটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে একধারে। লাইন ক্লিয়ার। সবুজ ঘাসের দিকে হুমড়ি খেয়ে আছে থুত্থুরে লরীটা। টং টং টং। বাজার শূন্য করে সবাই এখন এখানেই। আস্তে আস্তে লোহার চাকা ঘুরছে সামনের দিকে। বাসের চাকাও। মিনির চাকাও। ময়দানের বুকের উপর ঝকঝকে রোদের মধ্যে কাঁটা ঘুরছে। দারুণ মজা···আঃ। টুঁই টুঁই সিটি ঝাড়বো নাকি একটা। থাকগে। কিন্তু আর পিছন ফিরে চাইবো না। শুধু সামনের দিকেই এখন আমি। ডান দিক দিয়ে আগের মত উল্টোদৌড় শুরু হয়েছে। জরুরী কোনো কাজ নেই আজ। রিকুইজিশান স্লিপটা জমা দেবো শুধু। ব্যস্। কাল থেকে পাওয়া যাবে কাজের কাগজ টাগজ। মনের মধ্যে কোনো রাগ টাগ নেই আর। শুধু আলুর জন্যই যা একটু। আলু বাঙালীর প্রিয় খাবার সন্দেহ নেই। এমনকি তাবৎ ভারতবাসীর। ভারতীয়দের মধ্যে অনেক বর্ণভেদ। আলুর মধ্যেও। গোলআলু-নৈনিতাল-রাঙালু-শাঁকালু। দুতিন মিনিট ভেবে দেখলাম তারা এখন সবাই যে যার কোলে ঝোল টেনে নিচ্ছে। ফরসা-বাদামী-উজ্জ্বল শ্যাম-কালো বাবুদের ঘরে ঘরে এখন আলুর কদর। সত্তর কোটির মধ্যে বেশীর ভাগ ওই কি বলে। হঠাৎ 'পা পিছলে আলুর দম' কথাটা শুধু শুধুই মনে পড়লো। তাবলে প্রকৃতির নিয়ম পাল্টায় নি। উল্টোপাল্টা ব্যাপারগুলো ঠিক ঠিক ঘটে চলেছে। নিয়ম কখনো পাল্টায় না। যেমন এই আমি এসপ্ল্যানেড ঈষ্ট-এর দিকে ঘ-

ঘ-ড়-ড়-ড় ঘটাং টং টং। আর বাস-ট্রাম-পথ-ময়দান ঝড়ের মত খিদিরপুরের দিকে। গোঁ-ও-ও-ও·· হুস্-স্-স্···স্যাং···শোঁ-ও-ও-ও এইসব শব্দ উঠছে চারপাশে। আর হাওয়ার শব্দ। কি সুন্দর ফুরফুরে হাওয়ায় এখন আমি। ঘ-ড়-ড়-ড়-ড় ঘটাং টং টং।

* * * * *

দুধের মত সাদা প্লেটের উপর চিকেন রোষ্ট্ থেকে ধোঁয়া উঠছে। সঙ্গে ভেজিটেবল স্যাণ্ডউইচ আর বেনানা সস্। ফরাসী মদের ফেনা উপছে পড়ছে বেলোয়াড়ী গ্লাসে। হাঃ··· ব্রিটিশ খাবারের সঙ্গে ফরাসী মদের কম্বিনেশন। কাঁটা চামচের রিমঝিম বাজনা। প্ল্যাষ্টিক রং করা দেয়ালে ঝাড়লণ্ঠনের রঙীন আলোর টুকরো। অদৃশ্য কোণ থেকে ডালিয়া লাভীর পুরুষালি 'গো গো' কোকেনের ধোঁয়ার মত ছড়িয়ে পড়ছে হাওয়ায়। ঠিক তখম দামী ডিনার স্যুটের রঙীন বো ঠিক করতে করতে করতে বিদেশী হোষ্ট্ ঝরঝরে বাংলায় জিগ্যেস করলো—ধনেপাতা দিয়ে কষা আলুর দম খাবেন মিস্টার?—এরকম ভাবতে আমার ভারী মজা লাগে। মনে হয় আলুর জন্যই আমার যা কিছু সব। যারা আমার সঙ্গে এখন ঘ-ড়-ড়-ড় ঘটাং দৌড়োচ্ছে মাকালীর দিব্যি গেলে বলতে পারি শতকরা নিরানব্বুই জন ঘুমের মধ্যে আলু হয়ে যায়। আর জেগে উঠলেই আবার। সকালে ওই জন্যে আজ একটু রাগ টাগ।

নইলে এমনিতে বেশ মেজাজেই আছি আমি। দেরী টেরি হয়নি এমন কিছু। ঘড়ির কাঁটা এখন দুটো পঞ্চাশের উপর। পাশের লোকটার ঘড়িতে দুটো তিপ্পান্ন। অনেকের ঘড়িতে এখন দুটো আটচল্লিশ থেকে তিনটে আট। প্রত্যেকের হাতে কাঁটা ঘুরছে। সব একসঙ্গে একদিকে। সময় ঘুরছে কাঁটার মত। এমন কি ট্রামের চাকাও। টং টং টং ঘ-ড়-ড়-ড় ঘটাং। দরজার মুখে বড্ড ভিড়। কেউ বস্তার মত ধপাস ছিটকে পড়বে। কেউ খুব ঠাণ্ডা মাথায় গড়িয়ে। এবার আমিও। অবশ্য সময় আছে অনেক।

*   *   *   *   *

কার্জন পার্কের রেলিং থেকে আয়েস করে চারমিনার কিনলাম। ৩০০ জর্দা দিয়ে একটা পান খাবার ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু দাঁতে পানের দাগ খুব বিচ্ছিরী লাগে। আসলে ওসব আমি খাই টাই না। একজনকে দেখে হঠাৎ মনে হল। অনেকেরই অনেককে দেখে এরকম মনে হয়। যাকগে। আমি মৌজ করে সিগারেট টানতে টানতে। বুঝতে পারছি রোদের তাপ এখন দুর্দান্ত। এখন পীচের রাস্তা থেকে গরম ছিটকে উঠছে। হাওয়া নেই। আমি থেমেছি বলে হাওয়াও অমনি। অবশ্য আড়াআড়ি কার্জন পার্কের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি বলে ‘মন্দের ভালো’ গোছের। তবে থেমেছি বলে গরম লাগছে

বেশ। আপেক্ষিক ব্যাপার বোধহয়। ফারনেসের ভিতর থেকে আগুন ঠিকরে উঠছে। ঘাম গড়িয়ে নামছে জামার ভিতরে। মুখটাও চট চট করছে। দুমিনিটের মধ্যে রুমাল কালো হয়ে গেলো। প্রকৃতির নিয়ম কখনো পাল্টায় না বলে আমার ফরসা রুমাল কালো হয়ে গেলো। রুমালটা কালো হচ্ছে বলে আমার মুখ আস্তে আস্তে পরিস্কার। মাথার চুল এখন পাট করে শোয়ানো সিঁথির দুদিকে। আর দাড়ি কামানো চকচকে মুখ। ঘড়িতে ঠিক তিনটে এক। অনেকের ঘড়িতে এখন দুটো উনপঞ্চাশ থেকে তিনটে উনিশ। সব ঘড়িতে কাঁটা ঘুরছে আলাদা আলাদা। একসঙ্গে একদিকে। দরজা দিয়ে ঢুকতেই গরম কমে গেলো ঝপ্ করে। হিমঘরে ঢুকলাম নাকি! খুব তাড়াতাড়ি ঘাম শুকিয়ে যাচ্ছে গা থেকে। দেয়ালজোড়া সাজানো কাঠের র‍্যাকে পুরোনো প্রায় রং হলুদ খবরের কাগজের স্তুপ। দেয়াল দেখা যায় না। ধ্যাড়ধেড়ে লম্বা টেবিলের দুপাশে দশ দুগুণে কুড়িটা চেয়ার এখন প্রায় ফাঁকা। জনা পাঁচেক হাফ্ বুড়ো লোক পাতা উল্টোচ্ছে মুখ নিচু করে। কাউন্টারের সামনে গিয়ে রিকুইজিশান শ্লিপ নিলাম। নামের জায়গায় নাম, নম্বরের জায়গায় নম্বর, সইটই সব লেখা হয়ে গেলো। এই বার কাগজের নাম আর সময় নির্দেশ বাকি। সামনে কাউন্টার টেবিলের ওপারে তিনটি গোল মুখ আলুর মত জেগে আছে। কি লিখব? গোল আলু? না নৈনিতাল? না রাঙালু?

মাথার ঠিক উপরে শব্দ উঠছে একটা। কোনো বাজনা টাজনা না। কেউ কাউকে চেঁচিয়েও ডাকছে না। ভারী একটা কিছুর, মানে ধাতুর সঙ্গে ধাতু ধাক্কা খাচ্ছে বার বার। সেই সঙ্গে কোরাস গলা। শুনতে শুনতে একঘেয়ে লাগে। তার মানে ছাদ পেটা চলছে আমার বাড়ির সামনে। অর্থাৎ ঢালাইয়ের আগে যা যা হয় আর কি। বোঝা যাচ্ছে ছাদের নীচে একটা ঘর থাকবে। আর সেটা নিশ্চয়ই একটা আস্ত বাড়ির অংশ। আমার বাড়ির উল্টোদিকে যে তিন কাঠা প্লট সেটা এখন ঘিরে ফেলা হচ্ছে। আর ওর মধ্যেই তৈরী হচ্ছে ঘরটা। ঘর মানে যেখানে মানুষ থাকবে। অর্থাৎ যার চার-পাশে চারটে দেয়াল। আর মাথাব উপরে ছাদ। ইট আর সিমেণ্ট দিয়ে দেয়াল তৈরী হয়। সিমেণ্ট সব সময় খাঁটি পাওয়া যায় না। তখন চুন-সুরকী-বালি দিয়ে মশলা তৈরী হয়। তারপর জলটল। প্রথমে পাশাপাশি সাতটা ইট। তার উপরে ছটা। আবার পাশাপাশি সাতটা। এই ভাবে সাজাতে গিয়ে ফাঁকে ফাঁকে চুন-সুরকী-বালির মশলা। আস্তে আস্তে জায়গা ধরা পড়ে খাঁচার মধ্যে। খাঁচা মানে দেয়াল আর কি। একটা মাপা ছক আছে সবটার। এইভাবে দেয়াল ঘিরে ফেলে ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে। উঁচু হয়, হতেই থাকে। তারপর।

ওই ঘরটা আর বড় হবে না। ছাদ পেটার শব্দ হচ্ছে কিনা। বুঝতে অসুবিধে নেই দেয়ালের সীমানা ঠিক হয়ে গেছে আগে থেকে। বড় জোর মাস দুয়েক লাগবে আর। তখন ঘরের উত্তরমুখো বসবে দরজা। পূব দিকের জানলায় মড্ ডিজাইনের গ্রীল। প্ল্যাস্টিক কালার দেয়ালে গগন ঠাকুরের ওয়াশ ছবির প্রিণ্ট থাকবে। কিছুদিনের মধ্যেই কেউ কেউ থাকতে আসবে ওখানে। নানা রকমের ফুর্তি দুঃখু টুখ্যু নিয়ে একের পর এক দিন কাটবে তার। সে এবং চারটে দেয়াল আস্তে আস্তে পুরোনো হবে তার পর। আর এইভাবেই। যাক গে।

তো মেয়ে হলে···

ঘরের দিকে তাকালে বোঝা যাবে সে সৌখীন। সৌখীন এই জন্যে যে জানালা দরজার পর্দাটর্দা একদিন অন্তর পাল্টানো হয়। বোঝা যাচ্ছে বেশ কয়েক সেট আছে। আর তাছাড়া দামী পালঙ্কে ফরসা বিছানা। মনে হয় বেশ যত্ন আছে সব কাজে। ডান দিকে দেয়ালের সামনে ফুল সাইজের আলমারি। রাজ এণ্ড রাজ হওয়াই উচিত। আল মারির গায়ে বেলজিয়াম গ্লাস। আর হ্যাঁ ড্রেসিং টেবিলও আছে একদিকে। টেবিলে নানাধরণের কস্‌মেটিক্‌স্ দেখা যাবে। মেয়েটি আর তার স্বামী দুজনেই সেগুলো ব্যবহার করে কিনা এক্ষুণি বলা যাবে না। তবে দেখে মনে হয় ভদ্রলোকের আয় বেশ ভালো। মেয়েটির সারাদিন একা একা কাটে। তখন সে খুব মন দিয়ে ঘর

সাজায়। পরিষ্কার করে। বইটই পড়ে। চুল বাঁধে। দেয়ালে ডিজাইন করে। নক্সা কাটা দেয়াল তার খুব পছন্দ। রাত্রে এইরকম কথাবার্তা হয়।

জানলার পর্দাটা খুব সুন্দর তো।

দেয়ালের সঙ্গে ম্যাচ করে কিনেছি।

কিছু প্ল্যাস্টিক ফুল এনে দেবো ডেকরেশন কোরো।

যেন দেয়ালের কনট্র্যাস্ট রঙ হয়।

ঘরটা আর একটু বড় হলে ভালো হত।

আর চৌকো না হয়ে পেছনের দেয়াল একটু ওভাল হতে পারতো।

তাহলে সিলিং উঁচু হয়ে বেশী হাওয়া ঢুকতো।

তাহলে দেয়ালে আরো একটা বাড়তি জানলা পেতাম।

কাল ট্যুরে যাচ্ছি···তোমার কি চাই বলো।

দেয়ালগুলো ন্যাড়া লাগছে।

আর একটু সাজানো দরকার।

কিছু করতে হবে দেয়ালের জন্য।

লোকটা ট্যুরে যাবার পর মেয়েটি দেয়ালের দিকে বেশী নজর দেয়। প্রথমে সবুজ বুটিদার পর্দা জানালা থেকে খুলে ফেললো। সেখানে লাগালো হলুদের উপর গোলাপী ফুলের নক্সাকাটা পর্দা। পশ্চিমদিকের দেয়াল থেকে ত্রিপুরার মুখোশ জায়গা নিলো দক্ষিণের দেয়ালে। দক্ষিণ থেকে ঠাকুর আর সাঁইবাবা চলে এলো পূবের জানলার দুপাশে। নীল ফুলের জায়গায়

গ্রে ফুল আর মেরুন রঙের পাতা। সবটাই অবশ্য দেয়ালের দিকে চোখ রেখে!

মানে নিখুঁত হওয়াই পছন্দ করে সে। দুপুরে শুয়ে শুয়ে কোনো দিন রেডিওর গান শোনে। বই টই পড়ে। মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখে কোথাও কিছু ফাঁক আছে কিনা। পর্দা থেকে দেয়াল। দেয়াল থেকে ছবি। ছবি থেকে সিলিং। সিলিং থেকে আলমারি। আলমারি থেকে মুখোশ। মুখোশ থেকে দেয়াল। এইভাবে বৃত্ত তৈরী হয়। একদিন গড়িয়াহাট থেকে হলুদ রঙের প্ল্যাষ্টিকের তৈরী মৌমাছি এনে গ্রে ফুলের উপর বসিয়ে দেয়। তারপর আর কিছু করার থাকে না। দেয়ালের পাশ থেকে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। একবার ভাবে দেয়ালটা গোল হলে ভালো হত।

একদিন তার বান্ধবী বেড়াতে এলো। সেদিন খুব হৈ চৈ করে কাটলো তাদের। দুজনে মিলে ঘর গোছালো, রান্না করলো, দেয়াল পরিস্কার করলো। খাওয়ার পর এ ওকে সাজালো মেমপুতুল, ও একে সাজালো সাহেবপুতুল। দুজনে গলা মিলিয়ে একটু হাসলো, একটু গান গাইলো, একটু ঝগড়া করলো। তারপরে ক্লান্ত হয়ে চুপ করে বসে রইলো দুজনে, অনেকক্ষণ। একসময় বান্ধবী শুকনো গলায় কথা বলে উঠলো।

ধুর্ তোর ঘরে বড় বেশী জিনিস।

দেয়ালগুলো আর একটু বড় হলে ঠিক হত, আর একদিক ওভাল।

নকল ফুল বিশ্রী লাগে।

আর একটু সাজাতে হবে দক্ষিণের দেয়ালটা।

মৌমাছিটা উল্টো মুখে বসিয়ে দে।

স্বামী ট্যুর থেকে ফেরার পর ঘরের দিকে মন দিলো দুজনে। তার ফলে পেতলের টবে ক্যাকটাস প্ল্যান্ট এলো দুটো। একটা ফ্রিজ। একটা মনপসন্দ্ আয়না। আর মধুবনী স্ক্রল। এরপর সে আগের চেয়েও মন দিয়ে দেয়াল সাজালো, ঘর সাজালো। ক্যাকটাস কম্পোজিসান রাখলো পূব দিকের দেয়ালে পাশাপাশি। দরজার ঠিক বাঁদিকে আলনা। যাতে বাইরে থেকে চোখে না পড়ে। মধুবনী স্ক্রল তেরছাভাবে ঝোলানো হল পশ্চিমের দেয়ালে। আর ড্রেসিং টেবিলের পাশে ফ্রিজ। কিন্তু সবটা পছন্দ হল না। তখন ফ্রিজ চলে এলো মধুবনীর দেয়ালে। প্ল্যাস্টিক প্ল্যান্ট জায়গা পেলো ড্রেসিং টেবিলের ডানদিকে। রাত্রে সে আর তার স্বামী নানা কথা বললো।

প্ল্যাস্টিকটা ফেলে দিয়ে মানি প্ল্যান্ট আনতে হবে।

তাহলে দরজার ওপরের দেয়ালটা খুলবে ভালো।

ঘরে কিন্তু অনেকটা জায়গা কমে গেলো।

আর একটু বড় হল না কেন ঘরটা।

তাহলে সিলিংটা উঁচু হত।

আর পেছনের দেয়ালটা ওভাল।

একটা ম্যুরাল করানো যেতো কিন্তু।

খুব ভালো হত তাহলে।

এবার একটু মুখ পাল্টানো উচিত। কেননা ওখানে যারা থাকতে আসবে তারা সবাই একরকম হবে বা এক ধাঁচের কথা বার্তা বলবে এটা ভাবার কোনো কারণ নেই। কেউ হয়তো বলবে, আকাশ যে এত বড় তার কোনো সাজগোজ লাগে না যে। আর উদোম পাহাড় তো ঠায় দাঁড়িয়ে একটুও নড়ে চড়ে না। কিন্তু যা হবার তা হবেই। এই যেমন ঘরের দেয়াল ফরসা থাকবে না। আস্তে আস্তে তার গায়ে দাগ ফুটে উঠবে। নোনা ধরবে পুরোনো ইটে। পলেস্তারা খসে যাবে। উঁইপোকা বাসা বাঁধবে ভিতরে। স্যাঁৎসেতে গন্ধ। চারদেয়ালের মধ্যে অন্যরকম পরিবেশ। তখন তো আগের আসবাবপত্র মানাবে না। আর ডেকরেশনও পাল্টে যাবে। ওই অন্ধকার ঘরে পা-বেঁকা তক্তপোষের উপর এক বুড়োকে মানায়। বুড়ো পঙ্গু হলেই ঠিক হবে। তার বুড়ি ছাড়া এই ঘরে আর কেউ আসবে না। ছেলে থাকতে পারে, কিন্তু এখন লায়েক হয়েছে বলে এই নোনাধরা দেয়ালের পাশে খাপছাড়া। বুড়োর দিন রাত্তির শুয়ে কাটে। তার পায়ের দিকে পশ্চিম দেয়ালের ধার ঘেঁসে গোটা দুয়েক টিনের বাক্স সাজানো থাকবে। নিশ্চয়ই রঙ জ্বলে যাবে ওগুলোর। আর অন্তত একটা তোবড়ানো। পূব দেয়ালে এখন ক্যাকটাস নেই। তার বদলে কেরোসিন কাঠের তক্তা দড়ি দিয়ে বাঁধা। তার উপরে পুরোনো তেঁতুলের জার, জড়িবুটি, খলনোড়া, দুটো টিনের কৌটো, পুরোনো ঘি. তেলের ডিবে, দক্ষিণের দেয়ালে গোটা কয়েক শাড়ি ধুতি দড়িতে

ঝুলছে। এইসব। বুড়ির গায়েও দেয়ালের মত বয়সের দাগ। ভরতুপুরে শুকনো লঙ্কা আর মুগডালের বড়ি রোদে দিয়ে বুড়ি বাঁধানো রকে বসে পাহারা দেয়। ঠিক তখন রান্নাঘরের টালির ছাদে বসে একটা কাক গম্ভীর গলায় ডাকে। বুড়ি সেখান থেকেই হুস হাস শব্দ করে। বুড়ো ঘরের মধ্যে কান খাড়া করে শোনে। হাতের কাজ শেষ হলে সন্ধ্যেবেলা বুড়ি পাশে এসে বসে। তখন দুজনে কথাবার্তা হয়।

কারুর কোনো কষ্ট নেই তো ?

না।

দাদাভাই হাঁটতে শিখেছে ?

হ্যাঁ।

আজ কত তারিখ ? কোন সাল ?

ওই তো কি বলে।

পূবের জানলা বন্ধ কেন ?

ওদিকে আর একটা ঘরের দেয়াল উঠছে।

পশ্চিমে ?

পশ্চিমেও।

হাওয়া কম, আর খুব অন্ধকার।

হ্যাঁ।

তারপর কথা শেষ হলে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে দুজনে। রাস্তায় ঝোপঝাড় নেই বলে ঝিঁ ঝিঁ ডাকে না। পাখির কিচমিচ নেই। রাত বাড়লে আলো নিবে যায় চারদিকে। তখন

দারুণ চুপচাপ সব। কিচ্ছু শোনা যায় না। অন্ধকার বেড়ে যায়। বাড়তেই থাকে।

দেয়ালের গল্প এখানেই শেষ। কিংবা আরো কিছুক্ষণ খেয়ালমত চলতে পারে। কারুর কিছু যায় আসে না। তাছাড়া ওই দুঘর বাসিন্দার চালচলন কথাবার্তা যখন আলাদা। সমস্যাটা থেকে যাচ্ছে অন্যভাবে। মানে নিজেকে একটু চালাক ঠাওরালে আড়ালে আড়ালে একটা হালকা যোগ পাওয়া যায়।

১। প্রথমের চকচকে মেয়েটির ঘরে আসবাব বাড়ছে আর দেয়াল ছোটো হচ্ছে।

২। বুড়োবুড়ীর ঘরের চারদিক ঘিরে দেয়ালের পর দেয়াল উঠছে।

৩। দু'দলেরই হাওয়ার অভাব বলে নালিশ আছে।

সমস্যা হোলো দেয়াল ছাড়া ঘর হবে কি ?

তাঁর পায়ে কম দামের স্যাণ্ডেল, গায়ে রঙীন টুইলের শার্ট, চুল রুক্ষ, আর তিনি প্যাণ্টের পকেটে দুহাত ঢুকিয়ে হাঁটছেন। হাঁটার মধ্যে সমতা নেই। একটু এলোমেলো। তাহলেও ঠিক বলা হলো না। কোথায় যাচ্ছেন জানা নেই এরকম ভঙ্গি। কপাল বেশ চওড়া কিন্তু নাক টিকোলো না। জোড়া ভুরুর নীচে চোখদুটো খুব ধাবালো হতে পারে দরকার হলে। এখন কিন্তু অন্যমনস্ক। দুদিকের ফুটপাতে হালকা তাকিয়ে যাচ্ছেন তিনি। তবে কিছু দেখছেন মনে হয় না। অনেকটা ঘুমের মধ্যে এরকম হাঁটে মানুষ। ফুটপাতে এখন অনেক দোকান। জামাকাপড় রঙচঙে শাড়ি গামছা গেঞ্জী সেফটিপিন রিবন। ভিড় উপচে পড়ছে পথে। ভিড়ের মধ্যে আলাদা করে চেনা যায় না তাঁকে। তাঁর মত শুধু শুধুই হাঁটছে না কেউ। তিনি সাধারণ কিন্তু একা। একাই তিনি পেরিয়ে গেলেন ভিড় দোকান বাজার। লক্ষ্মীবাবুর সোনার দোকান বা এম্পায়ার স্টোরস্ কিছুই তার নজরে এলো না। ফাঁকা চোখে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। রাস্তার খোঁড়াখুড়ি এড়িয়ে অনেকদূরে কিছু দেখতে চাইছেন এরকম মুখের ভাব তাঁর। অথবা কিছুই দেখছেন না। হাঁটতে হবে বলে হেঁটে চলেছেন এরকমও হতে পারে। তখন বাস-

ট্যাক্সী-প্রাইভেট সারি দিয়ে যাচ্ছে আসছে। ঘড় ঘড় ঝকর ঝকর ঝম ঝম আওয়াজ উঠছে অনবরত। মাছির মতো মানুষ লেপ্টে আছে গায়ে। কানের কাছে খুব জোরে হর্ন বাজিয়ে গেল কেউ। তিনি চমকে উঠলেন একটু। কোথায় যেন কি যেন। তিনি ভাবতে চেষ্টা করলেন, তিনি কে? দমকা হাওয়ায় ঢেউ উঠেছে হ্রদের জলে। দিগন্ত ছড়ানো হ্রদ। কানায় কানায় ভরে আছে জল, আর ম্লান চাঁদের আলো। দুপার ঘিরে রেখেছে উঁচু গাছপালা। হঠাৎ দেখলে মনে হবে লোকজনের কাছ থেকে খুব যত্ন করে আড়াল করা হয়েছে। ছবিটা মিলিয়ে গেলো। তিনি এবার জেব্রা ক্রসিং পার হয়ে এলেন। এপাশে বিড়লা-প্ল্যানেটোরিয়ামের ঠিক উল্টোদিকে মাটির ঢিবি আকাশে ঠেলে উঠেছে। উঁচু নীচু ঢিবি সারি দিয়ে এগিয়ে ময়দানের মধ্যে ঢুকে গেছে। গাছপালা গজিয়ে উঠেছে ঢিবির উপরে। আগাছার ঝোপ। সরু পায়ে চলা পথ এঁকে বেঁকে উঠে গেছে মাথায়। কিছু ঘাস গজিয়েছে দুপাশে। পাহাড় পাহাড় ভাব আছে জায়-গাটার। বেশ নিরিবিলিও। পায়ের নীচে ঘাসে ছাওয়া ময়দান উপত্যকার মত ছড়িয়ে আছে। দূরে দূরে গাছপালার জটলা। একপাল ভেড়া চড়ছে ওখানে। জায়গা পছন্দ হওয়াতে তিনি বসে পড়লেন ঘাসের উপর। পাহাড়ের উপর থেকে হাওয়া ছড়িয়ে পড়ছে উপত্যকায়। উঁচু অশ্বত্থের মাথা নড়ছে। ঝোপঝাড় দুলছে মনের আনন্দে। দল ভেঙে

ভেড়ার পাল ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। ছোকরা মেষপালক সরু লাঠি ঝাঁকিয়ে তাড়িয়ে আনতে চাইছে। বট অশ্বত্থের জটলার মধ্যে হাওয়ার শব্দ উঠছে। পাতায় পাতায় ধাক্কা লাগার আওয়াজ। উপত্যকার উপর থেকে হাওয়া ছুটে এলো তাঁর দিকে। ঠাণ্ডার ঝাপটা লাগতেই একটু শিউরে উঠলেন তিনি। আর তক্ষুণি মনে পড়লো একটা শব্দ। পাহাড়ের চূড়ার দিকে তাকিয়ে তিনি গম্ভীর গলায় বললেন 'অশ্ব'।

ঘোড়াকে এই নামেই জানেন তিনি: কোনো শব্দের পেছনে আলাদা একটা মানে লুকিয়ে থাকে। ঘোড়া এই অর্থে গতিবেগ। তার মানে এমন একটি প্রাণী যার নাম বললেই বিশেষ অবস্থার বোধ আসে। কিছু মনে পড়ছে এরকম মুখের ভাব হলো তাঁর। এখন তাঁর চোখ পুরোপুরি খোলা। ফুরফুরে হাওয়ায় রগের দুপাশের রুক্ষ চুল উড়ছে। এভাবেই হঠাৎ জাগেন তিনি, জেগে উঠতে থাকেন। ঋগ্বেদের একটি শ্লোক মনে পড়লো। যার মানে দাঁড়ায় আগুন, হাওয়া এবং যে যে পদার্থে তীব্র গতিবেগ আছে তাদের 'অশ্বি' নামে ডাকা হয়। এখন ঘোড়ার ক্ষুরে আগুন ছিটকে উঠছে। হাওয়ায় উড়ছে কেশর। চমৎকার একটি উত্তেজনা ঘোড়ার মাংসপেশীতে ছোটাছুটি করে। ঝাঁটার মতো ফুলে ওঠে পাতলা লেজ। হালকা মেঘের দিকে মুখ তুলে চিঁহি-হি ডাক ছাড়ে। তাঁর কানে ভেসে আছে সেই আওয়াজ।

কি যেন কোথায় যেন, এরকম মনে হয়। অস্থিরতা ছটফট করে ওঠে মাথার মধ্যে। মুখের পেশীতে টান ধরে কিরকম। তিনি চোখ তুলে দেখলেন হ্রদের তীর দিয়ে চাঁদের আলোয় দারুণ গতিতে ছুটে যাচ্ছে তেজী ঘোড়া। তারপর ধুলোর ঝড় তাড়া করে গেলো। এই সময় একটা গোলমাল উঠলো ময়দানের মধ্যে। একদল কমবয়সী ছেলে ফুটবল খেলা শুরু করলো একটু দূরে। তাদের হৈ হৈ শব্দে মুখ ফিরিয়ে চারপাশ দেখলেন তিনি। ততক্ষণে দৃশ্য পাল্টে গেছে এদিকে ওদিকে। ছোকরা মেষপালক দলবল সমেত অদৃশ্য হয়েছে। সব জায়গায় এলোমেলো ঘুরছে হাওয়া খাওয়া মানুষ। গাছের ছায়া লম্বা হয়েছে আরো। বিকেল ফুরিয়ে যাচ্ছে আকাশ থেকে। বৃক্ষকুঞ্জে খুব তাড়াতাড়ি প্রেম সেরে নিচ্ছে তরুণ-তরুণীর জোড়া। এই সময় অস্পষ্ট ঘড় ঘড় শব্দে বাঁ দিকে ফিরে তাকালেন তিনি। অনেকদূরে রাস্তার উপর গাড়ির জটলা। বাস-টেম্পো-ট্যাক্সি-প্রাইভেট। গায়ে গা লাগিয়ে পিঁপড়ের সারির মতো সবাই। তিনি ভাবলেন যুদ্ধযাত্রায় চলেছে কেউ। তাহলে আমি এখানে কেন? আরেকবার চমকে উঠলেন তিনি। মাথায় হাত দিয়ে কিছু খুঁজলেন চুলের মধ্যে। তারপর পকেটে হাত ঢালেন। তন্ন তন্ন করে খোঁজার পর তাঁর হাতে উঠে এলো বাইশটাকা আটাত্তর পয়সা এবং একটি তোয়ালে রুমাল। টাকাগুলো কিছুক্ষণ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। এই মুদ্রা আমার প্রয়োজন

মেটাবে, মনে মনে উচ্চারণ করলেন তিনি। ধুলো উড়ছিলো এলোমেলো হাওয়ায়। ঘাড়ে গলায় বালি কিচ কিচ করছে। গায়ের মধ্যে গুমড়ে উঠছে অস্বস্তি। রুমাল দিয়ে ঘাড় মুখ গলা ঘসে ঘসে মুছলেন তিনি। দুহাত গোল করে দূরবীনের মতো চোখের উপর রাখলেন। তারপর শান্ত ভাবে চোখ কুঁচকে গাড়ির জটলার দিকে চাইলেন। একটা ডবল ডেকার তিনটে প্রাইভেট একটা টেম্পো দুটো ডবল ডেকার দুটো ট্যাক্সী একটা ছ্যাকড়া ঘোড়ার গাড়ি একটা মিনি একটা প্রাইভেট। খুঁটিয়ে দেখে গেলেন। পরপর। ওর মধ্যে ছ্যাকড়া গাড়ির উপরেই চোখ আটকে গেলো তাঁর। কেমন চেনা লাগছে। তিনি ভাবতে চাইলেন, কোথায় যেন কি যেন। ঠিক তখন জ্যাম সরিয়ে এঁকে বেঁকে চলতে শুরু করলো পিঁপড়ের সারি। দমকা হাওয়া ছুটে এলো মাঠের ওপার থেকে। গাছপালা মাথা ঝাঁকিয়ে নড়েচড়ে উঠলো। ছেলের দল অকারণে ছুটোছুটি বাড়িয়ে দিলো। একটা জমাট কুয়াশা সরে যাচ্ছে এরকম মনে হলো তাঁর। তিনি খোলা ময়দানের দিকে চেয়ে স্পষ্ট বলে উঠলেন ‘রথ’।

রথ মানে চারটে চাকার উপর ছড়ানো পাটাতন। পাটাতনের চার কোণে চারটে সোনার থাম। মাথায় দামী চাঁদোয়া মন্দিরের চূড়ার মতো উঁচু করে বাঁধা। চূড়ায় রূপালী নিশান উড়ছে হাওয়ায়। দুরন্ত ঘোড়ার টানে চাকা ঘুরছে বন বন। রাজার রথে এখন যুদ্ধযাত্রা শুধু তাঁর অপেক্ষায়। আবার মাথায় হাত

দিলেন তিনি। চুলের মধ্যে খুঁজলেন কিছুক্ষণ। এখানে কিছু একটা ছিলো। তাঁর শক্তি-বল-বুদ্ধি যাই হোক। এখন নেই। কথা ছিলো তিনি শরবিদ্ধ হবেন। হন নি। দৈব সাহায্য করেছে বলে মাথার মণি নিয়ে হারিয়ে গেছে তীর। সেই তাঁর পথ হাঁটার শুরু, আর খোঁজাখুঁজির পালা। এতক্ষণে সজাগ হলেন তিনি। তিনি কে কেন এবং কোথায় স্পষ্ট বুঝতে পারলেন। একটা সন্দেহ এলো মনে। শরীরের মধ্যে অস্থিরতা দেখা দিলো। তিনি ছটফট করে উঠে দাঁড়ালেন ঘাসের উপর। ততক্ষণে সন্ধ্যে পেরিয়ে রাত নেমেছে চারদিকে। ময়দান ছেড়ে চলে গেছে লোকজন। হাওয়া আরো ঠাণ্ডা হয়েছে। এখন শূন্য মাঠে তিনি একা আর এক ঝাঁক মশা। হাত দিয়ে প্যাণ্টের ধুলো ঝাড়লেন। একবার মশা তাড়াবার চেষ্টা করলেন হাততালি বাজিয়ে। মশার ঝাঁক ব্যস্ত হলো না। বাঁ পাশে এক ফুট সরে গিয়ে গুণ গুণ শব্দ তুললো। ও নিয়ে মাথা ঘামালেন না তিনি। তাঁর রওনা হবার সময় এখন। যেভাবেই হোক সেই হারানো জিনিস চাই। মুখের পেশী শক্ত হলো তাঁর, চোখ তীক্ষ্ণ হলো, নাকের ফুটো ডিমের কুসুমের মতো লাল ফুলে উঠলো। খুব তাড়াতাড়ি মাঠের মধ্যে দিয়ে আড়াআড়ি ময়দান পেরোতে লাগলেন। তখন দারুণ অন্ধকার ঢেকে ফেলেছে চারদিক। অনেক দূরে আলোর ফুটকির মতো মশাল জ্বলছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। এ দৃশ্য খুব চেনা তাঁর। মশাল হাতে কত রাত যুদ্ধক্ষেত্রে একা ঘুরে বেড়িয়েছেন। সঙ্গী ছিলো শিয়াল আর

বুনো কুকুরের দল। আবার সন্দেহ এলো মনের মধ্যে। অন্ধকার আকাশ থেকে তারার আলো নেমে আসছে। সেদিকে চেয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, কিন্তু এতকাল পরে কি লাভ! শন শন হাওয়া বইলো ময়দানে। ডান পাশ থেকে গোটা কয়েক উঁচু অশ্বত্থ মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলো তাঁকে। তিনি পিছনে তাকিয়ে দেখলেন পাহাড়ের গায়ে দলা পাকিয়ে আছে কালো অন্ধকার। আর খুব তাড়াতাড়ি মাঠ পারাপার করলো হাওয়া। তিনি ভাবলেন, তাহলে যুদ্ধ কি শেষ? তারপর মাঠ পেরোতে থাকলেন। দারুণ অন্ধকারে তাঁর শরীর একেবারে ঢাকা। আলো থাকলে কিন্তু দেখা যেতো কপালের উপর তিন চারটে ভাঙা দাগ আর চোখের নীচে কালচে চামড়া কুঁচকে আছে। এটা অবশ্য তাঁর মনের দুমুখো চিন্তার কারণে। আর তিনি যে সেটা জানেন তাঁর ভাবভঙ্গিতে বেশ বোঝা যাচ্ছে। এখন সময় আর অন্ধকার তাঁকে চেপে ধরেছে চার পাশ থেকে। একে কি মোহপাশ বলা যায়! তাঁর মনে পড়লো এই যুদ্ধে তিনি একা এবং শেষ সেনাপতি। কিন্তু এখন অন্য কাজ বাকি আছে। যা হারিয়ে গেছে আগে তার খোঁজ চাই। তারপর। তাঁর পিছনে জমাট ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়। পায়ের নীচে সরে যাচ্ছে সবুজ উপত্যকা। চোখের সামনে ঠিকরে ওঠে জোনাকির ঝাঁক। মাঠ পেরিয়ে রাস্তায় নেমে এলেন তিনি। এখানে অন্ধকার নেই। মশালের আলোয় পিচঢালা পথ কি দারুণ নির্জন। সামনে বাবুঘাটের বাঁধানো চত্বরে জনাচারেক

ভিখারী আর একটা বেওয়ারিশ কুকুর। অচেনা মানুষ দেখে অভ্যেসমতো ঘেউ করে উঠলো একবার। তারপর লেজ গুটিয়ে শুয়ে পড়লো। চারদিক চুপচাপ। তিনি কিনারায় এসে দাঁড়ালেন। পনেরো হাত নীচে ঘোলা জল পাক খেয়ে উঠছে। অনেকদূরে ছায়ার মতো দু একটা খেয়া নৌকো। ছলাৎ শব্দ উঠছে পারের কাছে। ঢেউ ভাঙ্গার আওয়াজ। বোধহয় জোয়ার এলো নদীতে। তারার আলোয় চক চক করে কালো জল। জল থেকে ফুরফুরে হাওয়া বইছে তীরের দিকে। খুব তাড়াতাড়ি ঘাম শুকিয়ে যাচ্ছে গা থেকে। জলের ধারে নুয়ে পড়া বেঁটে অশ্বত্থের ডালে পাখির দল কিচির মিচির ডাক ছাড়ে। এই আকাশ আর পাখির ডাক, খোলা নদীর বুক আর তারার আলো, এইসব দেখে শুনে তিনি গম্ভীর সুরেলা গলায় বলে উঠলেন 'কি সুন্দর!' ঠিক তখন অনেকদূরে দারুণ নির্জনতার মধ্যে জেগে উঠলো তীক্ষ্ণ চিঁ হি হি ডাক। তিনি চমকে উঠে শুনলেন ফাঁকা পথের উপর এগিয়ে আসছে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ। শব্দের ধাক্কায় নড়েচড়ে উঠলো তাঁর শরীরের শিরা-উপশিরা। অস্থিরতা ছিটকে এলো চোখের চাউনিতে। ভালো লাগা টাগার দুর্বলতা আমাকে মানায় না, এইরকম মুখ করে তিনি পথের উপর এসে দাঁড়ালেন। দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে যে রাজার রথে তাঁর যুদ্ধযাত্রা শুরু হয়েছিলো এই ছ্যাকরা গাড়ির সঙ্গে তার অনেক তফাৎ। এই ঘোড়া অনেকদিন পেট ভরে খেতে পায়নি বলে রোগা হাড় বের করা। পুরোনো কাঠের তক্তা রোদে জলে ফাটল

ধরেছে। এ গাড়ির চূড়ায় কোন যুদ্ধজয়ের নিশান নেই। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। তিনি জানেন বিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধই একমাত্র সত্যি। বাবুঘাটের সামনে নদীর তীর থেকে এক ঘোড়ার ছ্যাকড়া গাড়িতে তিনি শুরু করলেন নতুন যুদ্ধযাত্রা।

———